শতেক বচন

১২শ শতকের কন্নড় ভক্তিকবিতা

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

শ্রীচরণেষু

শতেক বচন

—

১০১ বীরশৈববচনসংগ্রহ

সংযোজন

আক্কা মহাদেবী

বচন ১—২৭

১

ক্ষুধায় রয়েছে ভিক্ষাঅন্ন
তৃষ্ণায় কূপ, দীঘি ও নদী
শয়নে রয়েছে ভাঙা মন্দির,
চেন্নামল্লিকার্জুন হে স্বামী,
সঙ্গী বলতে তুমিই আছো।

২

অষ্টবিধির অর্চনায় কি তোমায় খুশি করা যায়, প্রভু ?
বহিরঙ্গের আচার থেকে যে অনেক দূরে তুমি
অন্তরঙ্গের ধ্যানে কি তোমায় খুশি করা যায়, প্রভু ?
অবাঙ্‌মনসগোচর যে তুমি
জপে, কি তপে, কি স্তোত্রে কি তোমায় খুশি করা যায় প্রভু ?
শব্দের অতীত শব্দ তুমি
ভাব জ্ঞানের মাধ্যমে কি তোমায় খুশি করা যায় প্রভু ?
মতি সুমতির অন্যপারে যে তুমি
হৃদয়কমলের মধ্যে তোমাকে বসাবো,
তাও তো হবে না, প্রভু
তুমি যে রয়েছো সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে
আমাকে দিয়ে তোমাকে খুশি করা —
অসাধ্য কাজ, প্রভু !
তার চে' বরং আপ্‌না থেকেই তুমি
সুখ খুঁজে নাও আমার ভিতর, নিজে।

৩

কায়াকে মায়া জ্বালিয়ে মারছে ছায়া হয়ে
প্রাণকে মায়া জ্বালিয়ে মারছে মন হয়ে
মনকে মায়া জ্বালিয়ে মারছে স্মৃতি হয়ে
স্মৃতিকে মায়া জ্বালিয়ে মারছে জ্ঞান হয়ে
জগৎ জুড়ে মানুষজাতের ওপর
কড়া হাতের চাবুক চালায় মায়া
হে চেন্নামল্লিকার্জুন
তোমার মায়ার ফাঁদ থেকে তো
একজনকেও দেখিনি মুক্তি পেতে

৪

যদি বলো মায়াকে ছেড়েছো
মায়া কিন্তু তোমাকে ছাড়েনি
মায়াকে তুমি ছাড়ো বা না-ছাড়ো
সে তোমার সঙ্গ ছাড়েনি—
মায়া যোগীর জন্য যোগিনী
শ্রমণের জন্য শ্রমণী
আর সন্ন্যাসীর জন্য স্তুতি।

তোমার ঐ মায়াকে আমি কিন্তু ভয় করি না,
চেন্নামল্লিকার্জুন হে—
এই তোমার দিব্যি!

৫

বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, আগম সবই তো খোসা কেবল
খোসাগুলোকে ঢেঁকিতে ছেঁটে লাভ কি ?
মনের বরং মাথাটা বাদ দিয়ে দাও
থাকুক কেবল অসীম—
হে চেন্নামল্লিকার্জুন !

৬

জগৎকর্মের বীজ রবি
ইন্দ্রিয়কর্মের বীজ মন
আমার কেবল একটিমাত্র মন
সেই মন এক হয়ে গিয়েছে তোমাতে
তাহলে এই জন্মমৃত্যুর জগতে
আমার আর কাজটা কী হে ?
চেন্নামল্লিকার্জুনস্বামী ?

৭

সাপের বিষদাঁত ভেঙে নিলে
তার সঙ্গে খেলা সুখকর
কায়ার বিকার ভেঙে ফেললে
কায়ার সঙ্গও বড় সুখকর
কায়ার বিকার এমনই, যেন
জননী রাক্ষুসী হয়ে গেছে!
চেন্নামল্লিকার্জুন—
তোমার ভক্ত যারা তাদের
কায়া থেকে গেছে, এমনটি
যেন বোলো না হে!

৮

দ্যাখো, দ্যাখো তাদের দুর্দশা, সেইসব পাহাড়পর্বত-
যাদের ইচ্ছে ছিলো খেলা করবে গঙ্গার সঙ্গে
তাদের দুর্দশা দ্যাখো সেইসব অরণ্য বনানী—
যাদের ইচ্ছে ছিলো খেলা করবে অগ্নির সঙ্গে
আর দ্যাখো ওদের দুর্দশা, সেইসব অন্ধকার রাত—
যাদের ইচ্ছে ছিলো আলোকের সঙ্গে খেলা করে
তাদের দুর্দশা দ্যাখো সেইসব গভীর অজ্ঞতা—
যাদের ইচ্ছে ছিলো খেলা করে জ্ঞানের সান্নিধ্যে

এইভাবে, হে পরাশিবমূর্তি হরদেব,
হে চেন্নামল্লিকার্জুন—দ্যাখো, দ্যাখো
তাদের দুর্দশা, ঐ যে আমার অগুন্তি জন্মান্তরগুলি
তোমার জঙ্গম লিঙ্গ নিয়ে
খেলা করেছিলো যারা…।

৯

গগনের গভীরতা জানে চন্দ্রমা কেবল
শকুন কী করে জানবে

তটিনীর গভীরতা জানে কমলই কেবল
ঘাসফুল কী করে জানবে

ভ্রমরা যেমন জানে পুষ্পপরিমল
কীট তা কী করে জানবে

চেন্নামল্লিকার্জুন হে

যেমন করে তুমি জানবে তোমার শরণদের
মোষের পিঠের মাছিরা
তা কেমন করে জানবে !

১০

গুটিপোকা যেমন নিজের বাসাটা
নিজের রসেই বাঁধে
নিজেরি বোনা জালে জড়িয়ে
মরে নিজের পাতা ফাঁদে

আমি তেমনি নিত্য জ্বলছি
নিজেরি বাসনাতে

প্রভু হে ঘোচাও এ দুরাকাঙ্ক্ষা
আমার মন থেকে
হে প্রভু দেখাও
আমাকে তোমার পন্থা !

১১

গাছে গাছে ঘর্ষণ হলো, আগুন জ্বললো
জ্বলে গেলো সমস্ত গাছপালা
আত্মায় আত্মায় ঘর্ষণ হলো, আগুন জ্বললো
জ্বলে গেলো সমস্ত তনুগুণ
এই কারণেই হে চেন্নামল্লিকার্জুন
মহাত্মাদের আত্মার সঙ্গে যুক্ত করো
আমার অধ্যাত্ম-অনুভব
আমাকে
বাঁচাও।

১২

ঝকঝকে তাঁর রক্তিমকুন্তল
মাথায় মণির মুকুট
ঝকঝকে দাঁত চমক দিচ্ছে
হাসিভরাট মুখে

দেখলুম সেই দিব্যস্বরূপ
চোখের আলোয় আলো করেছেন
চোদ্দ ভুবন

দেখলুম, আর দর্শনে তাঁর
চিরতরে
ঘুচলো চোখের দৈন্যদশা
আমার
দাম্ভিক সেই শাসক,
যিনি পুরুষদেরও
পৌরুষে তাঁর বানিয়ে ফ্যালেন নারী

লীলা করেন জগদাদি শক্তি সনে
চেন্নামল্লিকার্জুন প্রভুটির শ্রীদর্শনে
প্রাণ পেয়েছি
নবীন

১৩

এলোকেশী, পাণ্ডুর আনন, কৃশতনু
ভাইসব, কেন কথা আমার সঙ্গেও ?
পিতৃগণ, কেন আর জ্বালাও আমাকে ?
হৃতশক্তি, ছিন্নজন্মডোর, মনোবল গত
ভক্ত হয়েছি, মিলেছি চেন্নামল্লিকার্জুনের
সঙ্গে—কুলটা হয়েছি ।

১৪

মুঠোর ধনটি কাড়তে পারো
    কাড়া কি যায় অঙ্গের ধন ?
গয়না কাপড় কাড়তে পারো
নির্বাণের যে ওড়না আমার
কেউ কি সেটা ফাড়তে পারো ?

মল্লিকার্জুন প্রভুর প্রভা অঙ্গে পরে
    লজ্জা ঘুচেছে —
গয়না কাপড় কী কাজে আর লাগবে, ওরে,
    ওরে পাগল !

১৫

অঙ্গ থেকে বস্ত্র যদি সরে
পুরুষ নারী লজ্জা খেয়ে মরে
প্রাণপ্রভু পূর্ণ করে আছো ত্রিভুবন
লজ্জা কোথা রাখি ?
তুমি বলো ?
হে চেন্নামল্লিকার্জুন প্রভু,
বিশ্ব যদি নেত্র হয়ে করে হে দর্শন
কী করে ঢাকবো আত্মা
কোথায় লুকোবো,
প্রভু, তুমি বলো

১৬

তোমাকেই জেনে নরকেও যাই যদি
সেই তো আমার মোক্ষ
তোমায় না-জেনে মুক্তিও পাই যদি
সেই তো আমার নরক
সেই সুখক্ষণও দুঃখের, যদি তখন তুমি
আমাকে না চাও
সেই দুঃখও সুখময় হবে আমায় তখন
চাইলে তুমি

চেন্নামল্লিকার্জুন স্বামী হে
যে বাঁধনে তুমি আমাকে বেঁধেছো।
সেই তো আমার অবন্ধন

১৭

অগ্নিবৃষ্টি হলে ভাববো ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটছে
আকাশ যদি মাথার ওপরে ভাঙে
মনে করবো স্নান হলো
আর পাহাড় ভেঙে পড়লে মাথায়
পুষ্পবৃষ্টি হবে
আর যদি শিরশ্ছেদ হয় হে চেন্নামল্লিকার্জুন
মনে করবো এই প্রাণ নৈবেদ্য দিলাম।

১৮

বন্ধ্যা জানে না প্রসববেদনা
সৎমা কি জানে মাতৃস্নেহ
কী করে যাতনা জানবে সে, যার
আঘাতের ক্ষত জানেনি দেহ ?

আমার শরীরে ভেঙে আছে ফলা
চেন্নামল্লিকার্জুনের ছোরার
কী যন্ত্রণায় কাঁপছি আমি, তা
কী করে জানবি, জননী, তোরা ?

১৯

আকুলিবিকুলি হৃৎপিণ্ডটা উলটে গেছে
যে বাতাস বয়, হঠাৎ ধরেছে আগুন তাতে
জ্যোছ্‌নাও হোলো রোদের মতনই গরম, সখা
আমি ঘুরি একা, খাজনাদারের মতন, গ্রামে।

মাগো তুমি ওকে বলো তো, যেন সে আসে এখানে
স্বভাবটা দ্যাখো মল্লিকার্জুনের কী রকম ?
দিন অন্তর দিনেই করবে মান অভিমান !

২০

শিখাহীন অগ্নিতে জ্বলে যাচ্ছি, মাগো
ক্ষতহীন আঘাতের বেদনায়, মাগো
সুখহীন নিশিদিন দুঃখ যাপি, মাগো
চেন্নামল্লিকার্জুনকে ভালোবেসে
জন্ম জন্ম ফিরে আসছি,
ফিরে আসছি, মাগো

২১

পরপুরুষেরা পাতার তলায় কাঁটার ব্যথা
স্পর্শ করতে পারিনে, পারিনে আসতে কাছে
পারিনে ওদের বিশ্বাস করে কইতে কথা
সব পুরুষের—চেন্নামল্লিকার্জুনটি বাদে,
বুকের ওপরে গিজগিজ করে কাঁটার বন
পারিনে ওদের করতে যে মাগো, আলিঙ্গন ?

২২

যা শুনে যাও দিদিভাই, স্বপ্ন দেখেছি !
দেখেছি, চাল-সুপুরি-ঝুম্‌কো, ঝুনো আভাঙা নারকেল
আর দেখেছি এক ভিখারী, নওল সন্ন্যাসী
চিক্কণ চুল ধবধবে দাঁত আমার দোরে হাত পেতেছে–
যাচ্ছিল সে নাগাল আমার পেরিয়ে, চলে—
আমিই ছুটে তার পিছনে দৌড়ে গেলুম
তার হাতে হাত যেই রেখেছি,
অমনি, এ কে ?
চেন্নামল্লিকার্জুনকে দেখেই
চোখ মেললুম !

২৩

ওগো মা
আমি সুন্দরকে মন সঁপেছি, যার
নেই ক্ষয় নেই মৃত্যু নেই রূপও
ওগো মা,
আমি সুন্দরকে মন সঁপেছি, সেই
অখণ্ড অনন্ত অরূপকে সুন্দর, যার
নেই জন্ম নেই ভয় নেই কুল নেই সীমাও
সেই চিরবরাভয় মল্লিকার্জুনই, মাগো,
আমার সুদর্শন প্রেমিক !

এইবারে অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে দাও তবে
এইসব মরণশীল স্বামীর দঙ্গল ।

২৪

মরকত-বেদী, কনক-তোরণ
হীরক-স্তম্ভ, প্রবালের চন্দ্রাতপ,
মুক্তা-মাণিক্যের ছত্রছায়ায় আমার বিয়ে হলো।
ওরা আমার বিয়ে দিলে
শঙ্খকঙ্কণ হরিদ্রার রাখী
গায়ে হলুদ দিয়ে ওরা
আমার বিয়ে দিলে
আমার মল্লিকার্জুনদেবের
সঙ্গে।

২৫

তরল ঘি আর জমাট ঘি-য়ে তফাৎ কী বা
প্রদীপ এবং দীপ্তিতে আর তফাৎ কী বা
অঙ্গেতে আর লিঙ্গেতে আর তফাৎ কী বা
অঙ্গ আমার গুরু করেছেন মন্ত্রায়িত

সাকার নিরাকারেই এখন তফাৎ কী বা
চেন্নামল্লিকার্জুনের সঙ্গে মিলন হয়ে
পাগল যে-জন, কী হবে তার বাক্যব্যয়ে ?

২৬

ফল এখন ভুক্ত, কী এসে যায়
গাছটা কেউ কেটে ফেল্‌ছে কিনা ?
নারীটি পরিত্যক্ত, কী এসে যায়
কেউ তার সঙ্গ করছে কিনা ?
জমিটা যখন পোড়ো, কী এসে যায়
কেউ তাতে আবাদ করছে কিনা ?
মল্লিকার্জুনকে জানা শেষ, কী এসে যায়
দেহটা কুকুরে খেল, না জলেই খেল ?

২৭

বনপাহাড়ীর চুড়োর ওপর বানিয়ে বাড়ি
জীব জানোয়ার ভয় পেলে কি চলবে নাকি ?

সমুদ্রসৈকতের ওপর বানিয়ে বাড়ি
ঢেউ-জোয়ারে ভয় পেলে কি চলবে নাকি ?

হাটবাজারের মধ্যিখানে বানিয়ে বাড়ি
হৈ-হল্লায় হট্টগোলে শিউরোলে হয় ?

চেন্নামল্লিকার্জুন, —শোনো, বলি—

এই জগতে জন্ম যখন নিতেই হবে
নিন্দে-স্তুতি যেটাই আসুক রাগ না-করে
শান্ত মনেই সব কিছু হয় মানিয়ে নিতে !

আল্লামাপ্রভু

বচন ২৮—৫৪

২৮

শরীরটাকে বাগান করে মনকে করলুম শাবল
উপ্‌ড়ে দিলুম ভ্রান্তির মূল যতো
এ সংসারের মাটির ঢেলা গুঁড়িয়ে ফেলে
ব্রহ্মবীজের রোপণ করা হলো
অখণ্ড মণ্ডলকূপ থেকে
বায়ুর চক্রে তুলে জল
সুষুম্নার নালী দিয়ে
সেচন করেছি
এখন ভয়
পাঁচ বলদে বীজ খেয়ে যায় পাছে ?
তাই
বেড়া দিয়েছি সংযমে
আর সহনশীলতায়
বড় সাধের চারাগাছটি যত্নে সামাল দিয়ে
কোজাগর প্রহরায় অতন্দ্র আছি হে গোহেশ্বর !

২৯

কথায় বলে, সোনা মায়া। সোনা মায়া নয়।
কথায় বলে, নারী মায়া। নারী মায়া নয়।
কথায় বলে, মাটি মায়া। মাটি মায়া নয়।

মনের সামনে যে আশা, মায়া সেই, গোহেশ্বর!

৩০

অজ্ঞানের দোলনায় ঘুমিয়ে আছে জ্ঞানের শিশুটি
বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রবাক্যের দড়ি ঝুলিয়ে
ভ্রান্তিমাতা তাকে শোনাচ্ছে ঘুমপাড়ানি গান
ঐ দোলনা ভাঙুক
ঐ দড়ি ছিঁড়ুক
ঐ গান থামুক
নইলে গোহেশ্বরের দেখা মিলবে না

৩১

জানতে জানতে সব জানা বন্ধ্যা হয়ে গেলো
ভুলতে ভুলতে সব ভোলা বন্ধ্যা হয়ে গেলো

'গোহেশ্বর' এই শব্দ, হায় !
একেবারে বন্ধ্যা হয়ে গেলো ।

৫১ । আল্লামাপ্রভু

৬৮ : ৩

৩২

কষ্টিপাথরে ঘষে সোনা মেলে
কিন্তু রংটি মেলে কি
ফুলটি পরতে পারো চুলে,
কিন্তু তার গন্ধটি পরতে পারো কি
কর্ম তুমি করে যেতে পারো
কিন্তু পরাবস্তু জানতে পারো কি
'গোহেশ্বর' শব্দটুকু মুখে বলতে পারো
কিন্তু তুমিই শিব হয়ে উঠতে পারো কি
হে সিদ্ধরামাইয়া ?

৩৩

শব্দ ? শ্রবণে অশুচি
স্পর্শ ? ত্বকে অশুচি
রূপ ? নেত্রে অশুচি
রুচি ? জিহ্বায় অশুচি
পরিমল ? ঘ্রাণে অশুচি
আমি ? জ্ঞানে অশুচি

একমাত্র গোহেশ্বর শিব
ভিন্নতার অশুচিতা উত্তীর্ণ একক
জ্যোতির গভীরে যিনি জ্যোত !

৩৪

শব্দ নাকি অশুচি—

কোথায় অশুচি, শব্দ, একমাত্র সংশয়ে ব্যতীত ?
ধুলো কি পারে বাতাসকেই অশুচি করে দিতে ?
গোহেশ্বর তা মনে করেন না, বাসবান্না।

৩৫

কুকুরগুলোর টানা হ্যাঁচড়া দেখেছো
ওরা সংসারের শবটাকে চিবিয়ে খেতে চায়
কুকুগুলোর হ্যাঁচকাটানে জেগে উঠে, দেখেছো
শবটা কেমন অট্টহাসি হাসছে ?

নাঃ ! গোহেশ্বর শিব নেই ওদিকে কোথাও

৩৬

প্রাণলিঙ্গ
শরীরটাকে করেছে তার বেদী
আকাশগঙ্গায় তার ধারাস্নান সারে
পুষ্পহীন পরিমলে পূজার্চনা পায়
'শিব' 'শিব' নিত্যনাদ ওঠে তার হৃদয়কমলে
এবং, হে গোহেশ্বর ! অদ্বৈত তো এই !

৩৭

আমিই কি দেব নই ?
তুমি আর দেবতা কিসের ?
তুমিই দেবতা হলে,
আমাকে পালছো কৈ, শুনি ?
তোমাকে আঁজলা ভরে এনে দিই
পিপাসার জল—
এবং ক্ষুধার অন্ন—
সেটুকুই বা কে দেয় তোমাকে ?
সেও আমি ! এই আমি !
আমিই দেবতা ভবে ? তাই নয় ?
বলো, গোহেশ্বর ?

৩৮

অগ্নি যখন কর্পূরগিরি খায়
ভস্ম থাকে কি পড়ে ?
তুষারে তৈরি শিবমন্দির চূড়ায়
রৌদ্রকলস বসে ?
জ্বলন্ত অঙ্গারে যদি ছোঁড়ো
গালার তীর
সে তীর কি ফিরে পায় ?
গোহেশ্বরকে চিনে গেলে
নিজের মন
আর কি ফিরিয়ে আনা যায় ?

৩৯

জ্বলন্ত অঙ্গার বৃষ্টি হলে
তুমি হোয়ো উদক
জলপ্রলয় যদি হয়
তুমি হোয়ো বায়ু
মহাপ্রলয় যদি হয়
তুমি হোয়ো আকাশ
জগৎপ্রলয় যদি হয়
আমি-ত্যাগ করে তুমি
গোহেশ্বরে এক হয়ে যেয়ো

৪০

বায়ু যখন নিদ্রা যেতে চায়
আকাশ শোনায় ঘুমপাড়ানি গান
শূন্য যখন পরিশ্রান্ত হয়
নিরালা ধরে স্তন্য তার ঠোঁটে
কখন্ আকাশ মিলিয়ে গেলো হায়
থামলো কখন্ ঘুমপাড়ানি গান
গোহেশ্বর এমনি করে আছেন
ঠিক যেন নেই তিনি।

৪১

তোমার তেজ দেখতে গেলাম
যেন শতকোটি সূর্যের উদয়
দেখলাম বিদ্যুৎ, আহা, যেন
কুঞ্জলতা, কিবা মনোহর !

গোহেশ্বর ! তুমি যদি
জ্যোতির্লিঙ্গ হও—
যাবতীয় তুলনা হারায়

৪২

স্ফটিকপ্রদীপটির মতো,
না আছে ভিতর তার — না বাহির —
এ রহস্য পরম বিস্ময়
চোখ দিয়ে ধরতে পারি
ধরা দেয় না মুঠোয়
নিকটে গেলেই সে সুদূর
রূপে মগ্ন হয়েছে অরূপ
শূন্য ডুবে গেছে সমাধিতে
দর্শনেই অমৃতপান, হায়, গোহেশ্বর !
মিলনের স্বাদ হবে না জানি কেমন ?

৪৩

তোমার জন্য জল আনবার পরে
স্নানের কথা রইলো না যার মনে
তোমার জন্য ফুল তোলবার পরে
অর্ঘ্য দিতে রইলো না যার মনে
তোমার জন্য ভোগ রান্নার পরে
নিবেদনটি রইলো না যার মনে
তাকেই তুমি আপনাতে নাও আপনি
নিলীন করে, হে গোহেশ্বর প্রভু !

৪৪

আমগাছটি কোথায় ছিলো ? কোথায় ছিলো কোকিল ?
কোথায় ছিলো তাদের সখ্যবন্ধন ?
কোথায় ছিলো পাহাড়ীকুল, কোন্ সাগরের লবণ ?
কোথায় ছিলো তাদের সখ্যবন্ধন ?
কোথায় ছিলেন গোহেশ্বর ? আর কোথায় আমি ?
কোথায় ছিলো মোদের সখ্যবন্ধন ?

৪৫

বহতা নীরের সর্ব অঙ্গে পা
জ্বলৎ অগ্নির সর্ব অঙ্গে জিহ্বা
বহতা বায়ুর সর্ব অঙ্গে অঙ্গুলি
আর হে গোহেশ্বর প্রভু
তোমার শরণের সর্ব অঙ্গ শিবলিঙ্গময়

৪৬

শিলায় যেমন পাবক থাকেন
উদকে যেমন প্রতিবিম্ব
বীজটি যেমন বৃক্ষে থাকে
শব্দে যেমন নৈঃশব্দ্য
শরণদেরই ভিতরে তেমনি
তোমার বসতি, গোহেশ্বর !

৪৭

অন্ন দাও নিরন্নকে
তৃষ্ণার্তকে জল
সত্য বলো, দীঘি খোঁড়ো, আয়ুশেষে
স্বর্গ পেতে পারো

কিন্তু মিলবে না ওতে শিবসত্য
শিবভক্ত যে 'শরণ' "গোহেশ্বর" চেনে
তার কোনো ফলৈষণা নেই !

৫৭ ৷ আল্লামাপ্রভু
৬৮ : ৪

৪৮

চিত্রকর রূপ ধরতে পারে
কিন্তু প্রাণ ? সে কি চিত্রে ধরা যায় ?
দিব্যশাস্ত্রে দীক্ষা দিতে পারে
কিন্তু ভক্তি ? সে কি শিক্ষা করা যায়

প্রভু, ও পরমাভক্তি, অভিন্ন তন্ময়—
ভক্তি যত্র তুমি তত্র
ভক্তি নেই, তুমিও উধাও
ওহে গোহেশ্বর !

৪৯

একটিবার আমাকে দেখাও
গোহেশ্বর প্রভু—
সেই জন, যে ছিঁড়েছে দৃষ্টির বন্ধন
সে-জন, যে পুড়িয়েছে মনের নির্যাস
সেই জন, যে জেনেছে শব্দের জনন।

৫০

বাসনার জন্য মরেছে শতকোটি
সুখের জন্য মরেছে শতকোটি
স্বর্ণ, কাম, ভূসম্পদ চেয়ে
মরেছে শতকোটি
কিন্তু হে গোহেশ্বর প্রভু
তোমার জন্য মরতে দেখিনি
একটিকেও।

৫১

শৈলশিখর যদি শীতে কাঁপে
কী দিয়ে ঢাকবো আমি তাকে ?
শূন্যকে উলঙ্গ লাগে যদি
কী দিয়ে ঢাকবো আমি তাকে ?
ভক্ত যদি অবিশ্বাসী হয়
কী দিয়ে তুলনা দেবো তাকে ?

৫২

যে ঘোড়াটাই দিক না কেন ছাই
কেবলই ঘোড়া পালটালে কী হবে
চড়তেই যদি না জানে ?
ওরা না বীর, না ধীর !

এজন্যেই তো ক্লান্ত ত্রিভুবন
ঘোড়ার জিন-ঘাড়ে ঘুরতে ঘুরতে
ওরা আর তোমাকে চিনবে কখন্
হে গোহেশ্বর ?

৫৩

গাঁথলে পাথরের মন্দির
গড়লে পাথরের ঠাকুর
চড়ালে পাথরের ওপরে পাথর

কিন্তু দেবতা কোথায় ?

সাড়ম্বরে যে করে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা
চূড়ান্ত নরকে যাবে সে যে
ওহে গোহেশ্বর !

৫৪

পুষ্করিণী, মন্দির, এই সব শুধু
পিছনে ফেলে আসা পায়ের ছাপ
কর্মকাণ্ড আর যোগক্রিয়াগুলি
জন্মমৃত্যুর আশ্লেষে বাঁধা
অতীত-ভবিষ্যের সূত্র ছিন্ন করে
সিদ্ধরামাইয়া, তুমি
গোহেশ্বরে লীন হয়ে বাঁচো।

বাসবান্না

বচন ৫৫—৮০

৫৫

যার আছে, সে বানিয়ে দেবে শিবমন্দির
আমি কি পারি ? গরীবদুঃখী মানুষ, প্রভু !
আমার পাদুটো থাম, এই দেহটাই নাটমন্দির
এই মাথাটাই স্বর্ণকলস হোক—
শোনো হে প্রভু কুডলসঙ্গমের
স্থাবর যা, তা বিনষ্ট হয় বটে
জঙ্গমের তো বিনাশ নেই জগতে।

৫৬

চকোর কেবল চাঁদেরই জন্য কাঁদে
সরোজিনী কাঁদে সূর্যোদয়ের জন্য
ভ্রমরা যেমন মধুর আশাতে কাঁদে
আমি কাঁদি প্রভু তেমনই তোমার জন্য
হে কুডলসঙ্গমদেবতা !

৬৭। বাসবান্না

৫৭

ঘরের মানুষ কি ঘরে আছেন ? না, নেই ?
চৌকাঠে ঘাস
মেঝে ভর্তি ধুলো
ঘরের মানুষ কি ঘরে ? না, বাইরে ?

দেহভরা মিথ্যা
মনভরা বাসনা
নাঃ, ঘরের মানুষ ঘরে নেই —
আমার কুড়লসঙ্গমের দেবতা !

৫৮

বচনে নাম অমৃত ভরে
নয়নে রূপামৃত ভরে
মননে স্মৃতির মধু ভরে
শ্রবণে কীর্তির মধু ভরে
হে কুডলসঙ্গমদেব
তোমার চরণকমলে
আমি ভ্রমরা

৫৯

উনুনে যদি আগুন লাগে, দাঁড়াতে পারো
কিন্তু মাটিটাতেই আগুন লাগলে—
দাঁড়াবে কোথায় ?
পাড়ই যদি জল খেতে সুরু করে
বেড়াই যদি
শুরু করে ক্ষেতটাকে গিলতে
গিন্নি যদি সুরু করেন ভাঁড়ার চুরি
মায়ের দুধেও বিষ মিশ্‌লে,
হায় দেবতা
কোথায় আমার নালিশ জানাই, পিতা ?
কুডলসঙ্গমদেব !
তুমিই যদি রাগ করলে, আমার ওপর
সইব আমি কিসের জোরে—
বলো, প্রভু ?

৬০

পরের চিন্তা কেন করি ?
নিজেরই কি ঢের চিন্তা নেই ?
কুডলসঙ্গমদেব আমায় দিকে চেয়ে
হাস্‌লেন কি না —
সেই চিন্তাটাই তো মস্ত, বিশাল —
মেঝেয় পেতে, সর্বাঙ্গে জড়িয়ে
গড়াগড়ি দেবার মতো
বড়ো সড়ো।

৬১

কেবল তারই ইচ্ছেমতন বাক্য বলো,
মন খুশি হয়
অন্যলোকের ইচ্ছেমতন বাক্য বলো,
মন অখুশি
কুডলসঙ্গম শরণদের যে বাসে না ভালো
সে ছাই-মনে আগুন জ্বালো।

৬২

বিগলিত করো আমাকে
হরণ করো আমার চিন্তার কলুষ
মার্জিত করো আমাকে
আবিষ্কার করো আমার প্রকৃত প্রভা
আমাকে আঘাত করো বারবার
সোনার নূপুরটি করে
গড়ে তোলো আমাকে
তোমারই শরণের চরণে
যেন বেজে উঠি
হে কুড়লসঙ্গমদেব।

৭৩। বাসবান্না
৬৮ : ৫

৬৩

জগৎটাকে জড়িয়ে আছে তোমার মায়া
আর তোমাকে জড়িয়ে আছে আমার মন
এই জগতের চাইতে তোমার শক্তি বেশি
আমার শক্তি তোমার চেয়েও আরেক কাঠি
হস্তী যেমন বন্দী খুদে আয়নাটাতেই
তেমনি করেই আমার ভিতর বন্দী তুমি
দেব্‌তা, আমার দেব্‌তা কুডলসঙ্গমের।

৬৪

লোহার পাত দিয়ে খুব কষে বাঁধলেই কি
কুমড়োটাকে চিরকাল শক্ত রাখা যাবে ?
কুমড়ো বলে কথা ! সে যাবেই পচে !
অশুচি মনের মানুষকে ধরে শিবে দীক্ষা দিলেই
সে কি ভক্ত হতে পারে ?
পচাফলে কেমন করে নৈবেদ্য দেবে তোমাকে
হে কুডলসঙ্গমের দেবতা ?

৬৫

সর্পের কুটিলতা বল্মীকের পক্ষে ঋজু বটে
নদীটির কুটিলতা সমুদ্রের পক্ষে ঋজু বটে

কুডলসঙ্গমদেব-শরণের যত কুটিলতা
লিঙ্গের পক্ষে ঋজু বটে

৬৬

চুল পাকবার আগেই
চামড়া কুঁচকোবার আগেই
এ শরীর শূন্যবাসা হয়ে যাবার আগেই
দাঁত পড়বার আগেই কোমর ভাঙার আগেই
অন্য লোকের বোঝা হবার আগেই
লাঠিতে ভর দেবার আগেই, মরণ
তোমার নাগাল পাবার আগেই

কুডলসঙ্গমদেবের শরণ নাও।

৬৭

উইটিবিটাকে পেটালেই কি গর্তের সাপটা মরে?
কঠোর তপস্যা দিয়ে হবেটা কী—
কুডলসঙ্গমের দেবতা, আমার প্রভু
কেমন করেই বা বিশ্বাস করবেন
তাকে, যে অন্তরে অশুচি?

৬৮

প্রেম বিনা পুজো আর প্রাণ বিনে কাজ
যেন পটে আঁকা ছবি।

পটে আঁকা রূপই বলো
আর পটে আঁকা আখ্ ই বলো
জড়িয়ে ধরলে ইষ্টি নেই
চিবিয়ে খেলে মিষ্টি নেই।

কুড়লসঙ্গমের দেবতা হে,
হৃদয় বিনে ভক্তি নেই॥

৬৯

জল দেখলেই ডুব দেয়
বৃক্ষ দেখলেই প্রদক্ষিণ করে

যারা শরণ নেয় জলের
জল, যা শুষ্ক হয়ে যায়
যারা শরণ নেয় বৃক্ষের
বৃক্ষ, যা শুষ্ক হয়ে যায়
হে কুডলসঙ্গমের দেবতা
কেমন করেই বা তারা জানবে
তোমাকে ?

৭০

পাথরের সাপ দেখলে,
ওরা বলে তার ফণায় দাও দুধের ঝারি
আর জীবন্ত সাপ দেখলে,
ওরা বলে তার ফণায় দাও লাঠির বাড়ি।

যখন খাদ্য নিতে সক্ষম হয়ে
জঙ্গম হয়ে তিনি আসেন
ওরা ভাগিয়ে দেয় তাঁকে
আর ভোগ দেয় শিলালিঙ্গকে,
যা ভোজনে অক্ষম।

ওরা, যারা কুডলসঙ্গমের 'শরণ'দের
প্রতি নির্মম, তারা
পাথরে মাথা খুঁড়ে-মরা মাটির ঢেলা।

৭১

যদি কথা বলো, মুক্তোর মালার মতো হয় যেন
যদি কথা বলো, মাণিক্যের দীপ্তির মতো হয় যেন
যদি কথা বলো, স্ফটিকশলাকার মতো হয় যেন
যদি কথা বলো, প্রভু যেন বলে ওঠেন "আহাহা"

কিন্তু কথাই যদি বলো, বিনা শ্রমে,
কুডলসঙ্গমের দেবতা
কেমন করে ভালোবাসবেন
তোমাকে ?

৭২

তাদের ওপর রাগ করে কী লাভ
যারা তোমার ওপর রাগে ?
তোমার তাতে লাভটা কী হয়,
তাদের বা কী ক্ষতি ?
দেহের ক্রোধে মহত্ত্বের নাশ
মনের ক্রোধে জ্ঞানের বিনাশ

ঘরের ভেতরের আগুন কখনো
পাশের বাড়িটাকে পোড়াতে পারে
নিজের বাড়িটা আগে না পুড়িয়ে ?

বলো হে কুডলসঙ্গমের দেবতা !

৭৩

সর্পাহত মানুষকে দিয়ে কথা কওয়াতে পারো তুমি
ভূতগ্রস্ত মানুষকে দিয়ে কথা কওয়াতে পারো
কিন্তু কথা কওয়াতে পারো না
ধনগ্রস্ত মানুষকে দিয়ে
একমাত্র দারিদ্র্য নামধারী জাদুকর
যেই তার উঠোনে পা দেয়
অমনি সে কলকলিয়ে কথা কয়ে ওঠে
হে কুড়লসঙ্গমের শিব !

৭৪

মর্ত্যলোক হলো কর্তার টাঁকশাল।
তাতে তৈরি টাকা যদি মর্ত্যে চলে
তবে স্বর্গেও চলবে
এখানে যা অচল
স্বর্গেও তা অচল

হে কুডলসঙ্গমের দেবতা!

৭৫

বচন তার গুড়ের মতন মিঠে
হৃদয়ে তার কেবল ভরা বিষ, প্রভু হে

নয়নে সে একজনকে ডাকে
বুকের মধ্যে ভাবে অন্য কাকে
বচনে অন্যত্র বাঁধা থাকে

তার কায় এখানে মন ওখানে বাক্ সেখানে—

এই চোরা-মনকে ভাবছে যারা বশ করেছে
সেই মানুষ-ভেড়াদেরকে আমি বলবটা কী?
কুডলসঙ্গমদেবতা হে!

৭৬

শিশুসমেত বারাঙ্গনা অর্থলোভে
নেয় যদি তার ঘরে নতুন পুরুষ কোনো —
না পারে সে দুধ দিতে তার বাচ্চাটাকে,
না পারে তার খদ্দেরকে তৃপ্তি দিতে।
এমনি কঠোর অর্থলোভের ফাঁদ, হে প্রভু
কুডলসমঙ্গদেবতা হে !

৭৭

আমার শরীর হোক তোমার বীণার দণ্ড
আমার মাথাটি হোক তার লাউ
আমার স্নায়ুরা হোক তন্ত্রী
আর আঙুল তোমার মিজরাপ হোক—
আমাকে জড়িয়ে ধরো বুকে
বাজাও বত্রিশরাগিণীতে—
কুডলসঙ্গমদেবতা হে !

৭৮

যে করে, সে আমি নই, প্রভু
যে দেয়, সে আমি নই, প্রভু
যে নেয়, সে আমি নই, প্রভু

সবই শুদ্ধ করুণা তোমার !

দাসীর অসুখ করলে সংসারে যেমন
গৃহকর্ত্রী নিজে খেটে মরে
আমার সমস্ত কর্ম তুমি নিজে করো—

কুডলসঙ্গমদেবতা হে

৮৯ । বাসবান্না
৬৮ : ৬

৭৯

তোমার জন্য নেচে নেচে আশ মেটে না পায়ের
তোমার মুখটি দেখে দেখে আশ মেটে না চোখের
তোমার স্তুতি গেয়ে গেয়ে আশ মেটে না জিবের
কী যে করি
কী যে করি ওঃ
দু'হাত ভরে পুজো করেও আশ মেটে না মনের
কী যে করি
কী যে করি ওঃ
শোনো হে শোনো দেব্‌তা ওগো কুডলসঙ্গমের
এবার তোমার উদর ফুঁড়ে
ঢুকবো তোমার ভিতর খুঁড়ে
খুব শিগগির খুব শিগগির ওঃ
কী যে করি কী যে করি নইলে বুঝি দেব্‌তা আমার
আশ মেটে না
আশ মেটে না ওঃ

৮০

উৎসবের ছাগশিশু
মঙ্গলসজ্জার টাটকা পত্ররাজি খেয়ে ফেলেছিলো
নিহত হবার কথা জানতো না বলে।
জন্মের দিনেই ছিলো তার মৃত্যুদিন।

ছাগশিশুটিকে বলি দিয়েছিলো যারা,
কুডলসঙ্গমদেবতা হে,
তারাও কি মৃত্যু এড়িয়েছে ?

শরণ-দশকের সংগ্রহ

বচন ৮১ — ১০১

৮১

বাঁধ নেই, স্রোতহীন নয় এই মহানদী·
আমি অশরীরী মাঝি এক—
মন-কড়ি যদি ফ্যালো
বন্ধ-মোক্ষ দুয়েই নিপুণ
মহানদী পারে নিয়ে যাবো
পৌঁছে দেবো শব্দহীন সীমানাবিহীন
সেই প্রিয় গ্রামে
অম্বিগরা চৌড়াইয়া ভক্তকবি ভণে।

৮২

দারিদ্র্যের অন্নচিন্তা
পেট ভরলে বস্ত্রচিন্তা
বস্ত্র পেলে অর্থচিন্তা
অর্থ এলে পত্নীচিন্তা
পত্নী পেলে পুত্রচিন্তা
পুত্র এলে ধনচিন্তা
ধনাগমে ক্ষতিচিন্তা
ক্ষতি নইলে মৃত্যুচিন্তা

শতজনকে কত দেখছি চিন্তায় ব্যাকুল
কিন্তু হায় একজনেরও
শিবচিন্তা নেই।
অম্বিগরা চৌড়াইয়া ভক্তকবি ভণে।

৮৩

কায়ক নিয়ে মগ্ন যে-জন
ভুলুক সে তার গুরুদর্শন
ভুলুক সে তার শিবের পূজন
ভুলুক জঙ্গম সাধুর তোষণ
কায়ক* স্বয়ং শ্রীশ্রীকৈলাস
কায়কেই অমরেশ্বর নিবাস ॥

*কায়ক : বীরশৈব শরণের অত্যাবশ্যক কায়িক পরিশ্রম

৮৪

অমৃতের কি ক্ষুধা পায় ?
জলের কি তৃষ্ণা পায় ?
ঈশ্বর কি বিষয় চান ?
সদ্‌গুরুর করুণা পেয়ে
দেবার্চনায় মজে আছে
যে মহাশরণ, সে কি
মুক্তি চায় ?
তার কাছে মুক্তি সহজাত
তার কাছে মুক্তিই স্ব-ভাব
সে কি খোঁজে তৃপ্তি আর সুখ ?

উরিলিঙ্গ পেদ্দি ভণে, বিশ্বেশ্বর ঞি

৮৫

পাতাল থেকে কি অর্ঘের জল আনতে পারো
রজ্জু অথবা সোপান বিনাই ?
পুরাতনগণ শব্দ সোপান তৈরি করে
দেখিয়ে গেছেন দেবলোকের রাস্তা, দ্যাখো
মর্ত্যলোকের মনের কালিমা ঘোচাতে চেয়ে
বচন-জ্যোতির মশাল জ্বালিয়ে দিলেন হাতে
কুডলচেন্নসংগমদেব শরণগণ

বৃক্ষের মধ্যস্থ অগ্নি বৃক্ষকে দগ্ধ করেছিলো
প্রভু হে —
বৃক্ষ জ্বলে গেলো
ধরিত্রীও পা পিছ্‌লে পতিত ধরায়
অগ্নি নির্বাপিত হলো
থেকে গেলো স্বয়ম্প্রকাশ পত্রগুচ্ছ —
এবং সে অগ্নিশিখা এসে
আমার হাতের তালুতে
মিশে গেলো
মুগ্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ করলাম প্রভু হে —
আমি যে দেখছিলাম, বাসবপ্রিয় কুডলচেন্ন বাসবন্না

৮৭

আত্মজ্ঞানই গুরুদেব
সাধনাই শিষ্য
চৈতন্যই দেবতা
তৃপ্তিই ধ্যান
শান্তিই যোগ

এও যদি না জানো, তবে
মাথা মুড়িয়ে লাভ কী ?
মহালিঙ্গ কল্লেশ্বরদেব যে
হাসবেন !

যখন আদি অনাদি ছিলো না
যখন শূন্য মহাশূন্য ছিলো না
যখন সাধ্য অসাধ্য ছিলো না
যখন রূপ অরূপ ছিলো না
যখন শব্দেরও জন্ম হয়নি
যখন দ্বৈত অদ্বৈত ছিলো না
যখন গণাধীশ, শঙ্কর, শশিধর
ঈশ্বর ছিলেন না
যখন বর্তন নিবর্তন ছিলো না
যখন উমারাণীর বিয়ে হয়নি
যখন কারুরই নামের সৃষ্টি হয়নি
হে কলিদেব
তখন তুমিই শুধু নিঃশব্দ শব্দময়
শব্দময় ছিলে

৮৯

মর্ত্যলোক জ্ঞানকে গলার মধ্যে ভরে
জাবর কাটছে। হায়!

জ্ঞান যে জানে না কেমন করে
টিঁকে থাকতে হয়। তাই
বিশ্বভুবন ছারখার।

বলো না, ভাই, কেমন করে বাঁচি?
আমি যে সংশয়ী
আধো আলো দেখি, আর আধো অন্ধকার!

ভাই হে অজগন্না, তোমার যোগবিভূতি
আমার চোখে পট্টি বেঁধে
আমাকে দান করেছে
দৃষ্টির দর্পণ।

৯০

বজ্রাহত কুয়োর কেন সিঁড়ি লাগবে ?
ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও কি মন জন্ম নেয় ?
প্রদীপ-জ্বালা ঘরে আবার আঁধার কোথায় ?

আত্মা যখন তদ্‌গত হয় আত্মাতেই
ব্রহ্ম কিংবা পরব্রহ্মে কাজটা কিসের
অজগন্না, বাবা ?

৯১

জলের তৈরি খেলনায়
নিরালার নূপুর বেঁধে
সে খেলতে দিয়েছে শূন্যকে

অগ্নি দিয়ে আসব গড়েছে
কর্পূরপুত্তলীর জন্যে

আগুন নিবেছে কিন্তু
কর্পূর যে এখনো অক্ষত !

আমি স্তম্ভিত, আমার ভাই
অজগন্নার যোগবিভূতিতে !

মনের মধ্যে ডুব দিয়েছেন ঘন*
ঘন-র মধ্যে ডুবে গিয়েছে মন
প্রভুর মধ্যে ডুব দিয়েছে মন ও ঘন
আমার আমি কোথায় গেলো -
অখণ্ডেশ্বর ?

* রূপ

১০৫ । শরণ-দশকের সংগ্রহ
৬৮ : ৭

৯৩

অন্তরে অনুভব করেছে পূর্ণ জ্ঞান
বাইরে পবিত্র কর্মে নির্মল করেছে নিজেকে
অতীত ভবিষ্যতের শঙ্কা নির্মূল করেছে
অঙ্গ যার পরিণীত বিশুদ্ধ আনন্দে
অভেদলিঙ্গের জ্যোতির্লোকে যার আনাগোনা
তেমন কোনো 'শরণ' দেখিয়ে—
আমাকে কৃতার্থ করো, অখণ্ডেশ্বর হে।

৯৪

কর্ম দিয়ে শব্দকে ভরে
শব্দ দিয়ে কর্মকে ভরে
শব্দ আর কর্ম দুইয়ের মধ্যেই
পূর্ণতাকে ভরে
ঈশ্বরের সঙ্গে যে এক হয়ে যায়
'শরণ' তো সে-ই।

৯৫

পরমদেবতার জন্য
মনই বেদী
দেহই মন্দির
স্মৃতিই পূজা
ধ্যানই পূর্ণতা

পূর্ণকুম্ভকে সাগরে ডোবানোর মতই
আমি নিমজ্জিত ছিলাম
তোমার দৈববিভায়

তুমি-আমি দ্বৈত ভুলে গিয়ে
আমি আর জানিনে কিছুই
হে অখণ্ডেশ্বর !

৯৬

মাতৃগর্ভস্থ শিশু জানে না মায়ের মুখছবি
মাতাও জানে না তার ভ্রূণের চেহারা
মায়া মোহে নিমগ্ন ভক্তেরা দেবতা চেনে না
দেবতাও চেনেননি সেই ভক্তদের মুখ —
— রামনাথ !

৯৭

জ্বলন্ত অঙ্গারে যদি একটি তৃণ রাখো
তৃণটিও অগ্নি হয়ে যাবে
শ্রীগুরুচরণে যদি এই দেহ রাখো
দেহটিও গুরুময় হয়ে যাবে—
ওহে রামনাথ !

৫

৯৮

অগ্নি জ্বলতে জানে, চলতে জানে না
পবন চলতে জানে, জ্বলতে জানে না
অগ্নি আর পবন একত্র না হলে
গতি অসাধ্য
মানুষ কেমন করে এসব
ক্রিয়াজ্ঞানভেদ জানবে বলো,
হে রামনাথ !

৯৯

দীর্ঘ কেশ, স্তন দেখা দিলে
ওরা বলে নারী,
শ্মশ্রু গুম্ফ বেরুলে, পুরুষ :

কিন্তু আত্মা, যার লীলা উভয় ক্ষেত্রেই,
নারীও না, পুরুষও সে নয়।
তাকে দ্যাখো, রামনাথ!

১০০

শরীর ধারণ যে করে তার আছেই খিদে
শরীর ধারণ যে করে সে বলেই মিছে
শরীরধারী বলেই আমায় বকতে তুমি
পারবে না হে, একটিবারও, বকবে না হে
নিজেই বরং তার চে' তুমি হে রামনাথ,
একটিবারও শরীর ধরো।

১০১

যখনি দুর্দশা আসে, ওরা
তোমাকে স্মরণ করে প্রভু
আর যেই দুর্দশা পালায়
তোমাতেই হোঁচট্ খেলেও
তোমাকে চেনে না ওরা আর
প্রভু রামনাথ !

সংযোজন

বীরশৈব বচন প্রসঙ্গে

বহুশতাব্দী আগে দক্ষিণভারতে রচিত হয় এক বিশেষ ধাঁচের ধর্মীয় কবিতা : 'বচন' অর্থাৎ মুখের ভাষা। এই ভাষাতেই নিজেদের আধ্যাত্মিক কামনা, বাসনা, ব্যর্থতা, চরিতার্থতার উন্মাদনা প্রকাশ করেছেন একান্ত ঈশ্বর অনুরাগী কিছু নারী-পুরুষ। বিংশ শতকের মানসও আকুল হয়ে ওঠে এই দ্বাদশ শতাব্দীর কবিতার মন্ত্রস্পর্শে।

হিন্দু ঐতিহ্যের ক্রোড়ে লালিত বচন-কবিতা, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের নানা দিকে বারবার আচার-অনুষ্ঠানে জর্জরিত পুরোহিত-শাসিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে 'ভক্তি'বাদ—শুধু ভক্তি দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগের চেষ্টা। 'বচন' কর্নাটকের ভক্তি-কবিতা।

দেড়হাজার বছরের ইতিহাস নিয়ে কন্নড় সাহিত্য, তামিল ও সংস্কৃত বাদে, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম। বিশ্বসাহিত্যে কন্নড় ভাষার অমূল্য অবদান এই বীরশৈব বচন। বচন-সাহিত্যের পটভূমি ও বচন-রচয়িতাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাচীন কন্নড় পণ্ডিতরা এই তুলনাহীন সাহিত্যকে দাক্ষিণাত্যের নব-উপনিষদ্ বলে অভিহিত করেছেন। এই বচন-রচয়িতা সন্তকবিরা দ্বাদশ শতকের মানুষ, তাঁদের অধিকাংশই একই সময়ে একই আশ্রমে বাস করতেন, উত্তর কর্নাটকের 'কল্যাণ' নামের শহরে। সত্য ও পূর্ণতার সন্ধানে ধ্যানমগ্ন এই ঋষিরা, জাতি-কর্ম-নারী-পুরুষ-শ্রেণী বিভেদকে গ্রাহ্য না করে পরস্পরের সঙ্গে গূঢ়তম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ দেওয়া নেওয়া করতেন। সহজ সরল কন্নড় ভাষায় তাঁরা কথা বলতেন এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ করতেন ছন্দোবদ্ধ কাব্যিক গদ্যের (নাকি গদ্যকবিতার?) মাধ্যমে, যা সর্বসাধারণের বোধগম্য হতো সহজেই। বীরশৈব সন্তকবিদের এই ছন্দোবদ্ধ বাণীই 'বচন' নামে পরিচিত। গদ্যে রচিত হলেও, চরিত্রে এগুলি নিখাদ কবিতা।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কর্নাটকে একটি অসামান্য নবজাগরণের মুহূর্ত এসেছিলো।

কল্যাণ নগরীতে রাজকোষাধ্যক্ষ সন্তকবি বাসবান্নাকে ঘিরে গড়ে ওঠে এক নতুন শিবভক্ত গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীরই অন্তর্গত ছিলেন বেশ কিছু বচন-কার। বাসবান্না ছিলেন বীরশৈব ধর্মের প্রবক্তা, বীরশৈব শৈব ধর্মেরই এক বিশেষ অংশ। আচার সর্বস্বতা-বিরোধী বীরশৈব ধর্মের ঝোঁক ছিলো ব্যক্তিগত চেতনা উন্মেষের দিকে। বৌদ্ধ, জৈন, যোগ আর তন্ত্র দর্শনের মিলিত প্রভাবে বেড়ে উঠেছিলো এই ধর্ম। অঙ্গ-লিঙ্গের মিলনই ছিলো এই দর্শনের মূল লক্ষ্য। জীবাত্মা (অঙ্গ) আর পরমাত্মার (লিঙ্গ) সম্পর্কের ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে বীরশৈবের জগৎ চরাচর। বীরশৈব ভক্তদলের মহান্ বিশ্বাসের আরেকটি ক্ষেত্র ছিলো কায়িক শ্রম। কি রাজার ছেলে. কি চাষার ছেলে, কারুরই বিনা শ্রমের অন্নে অধিকার ছিলো না। "শরীরী পরিশ্রমে আমার দরকার নেই যেহেতু আমি মন্ত্রী, কিংবা পণ্ডিত" এ কথা বলার অধিকার কারুরই ছিলো না। প্রত্যেককেই কিছু শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে অন্নের অধিকার অর্জন করতে হত। এঁদের পরিচয় ছিলো 'শিবশরণ'—শিবের শরণাগত ভক্ত। এঁরা কায়িক শ্রমের নাম দিয়েছিলেন "কায়ক" এবং "কায়ক" ছিলো স্বর্গস্বরূপ। কাজই পুজো। শ্রমই সাধনা।

ধর্মে সর্বজনের সমানাধিকার, এবং কায়িক শ্রমের আধ্যাত্মিক মূল্যস্বীকার—এই দুটি বিশ্বাস বীরশৈব ধর্মের মূলে রসসিঞ্চন করতো। বচন-কবিদের মধ্যে কেউ ছিলেন ধোপা, কেউ মুচি, কেউ তাঁতি, কেউ মাঝি, কেউ-বা বারবণিতা। (এমনকি একদা-চোরও ছিলেন একজন !) প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতেন, জীবনযাপন করতেন পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে। সর্বমানবের সমানাধিকারে বিশ্বাস থাকার ফলে, অনেকেই তাঁদের বিপ্লবী সমাজ-সংস্কারক মনে করেন—তবে এই ধারণা হয়তো ঠিক নয়। বীরশৈব গোষ্ঠী ধর্মীয় বিশ্বাসকে জীবনে প্রতিফলিত করে বটে, কিন্তু তাদের বক্তব্য অতি সহজ। আত্মা যে বর্ণ-লিঙ্গ-শ্রেণী নির্বিশেষে, পুরোহিতের মধ্যস্থতা ছাড়াই প্রত্যেকের মধ্যে বর্তমান, শুধু এইটুকুই। কোনো সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো না। কিন্তু যে কোনো 'বিপথগামী' সন্তানকেই শেষ অবধি সর্বংসহা হিন্দু সমাজ পরম যত্নে ফিরিয়ে নেয়। আর তাই আজকের বীরশৈবরা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আবার ফিরে

গেছে সেই জাতি-বর্ণ-বংশের গণ্ডীর মধ্যে। বচন-কবিদেব বক্তব্য কিন্তু মূলত একই রয়ে গেছে – তাঁদের ভ্রাতৃত্ব আত্মার ভ্রাতৃত্ব, — জাগতিক নয়।

বীরশৈব ধর্মের প্রকাশ সর্বভারতীয় দর্শনের ভাষায়, কিন্তু তাতে তার নিজস্ব স্থান, কাল এবং পরিপ্রেক্ষিতের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়নি। সংস্কৃতে নয়, এই বচন রচিত হয়েছে কন্নড় ভাষায় – যে ভাষায় কবির ব্যক্তিগত অনুভবের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ সম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে বচনকাররা অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, তাঁরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত ছবি দিয়েই সহজে সাজিয়ে নেন কাব্যচিন্তা ও অধ্যাত্মতত্ত্ব।

এই সন্ত-সম্প্রদায়ের জীবনযাপন ছিলো পরস্পর-নির্ভর। আধ্যাত্মিক ভাব-বিনিময় তাঁদের কাছে অপরিহার্য। ভক্তি-কবিরা ছিলেন আচার-বিরোধী, পুরোহিতের মধ্যস্থতার বিরোধী, পশুবলিরও বিরোধী। এমনকি তাঁরা শাস্ত্রনির্ভর পাণ্ডিত্যেরও বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছিলেন। তাঁদের ধর্ম ছিলো অন্তর্মুখী, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের ধর্ম। কর্মযোগে তার আংশিক বিকাশ। কিন্তু কোনো কর্ম বা জ্ঞান সার্থক হয় তখনই, যখন তার ফলে ভক্ত-ভগবানের একাত্মতা সম্ভব। সহায় কেবল আকুল ভালোবাসা, আন্তরিক ভক্তি আর ঈশ্বরের করুণা।

ভক্তি-কবিদের ঈশ্বর ব্যক্তিগত ঈশ্বর। প্রিয়সখা। প্রত্যেক ভক্তের কাছে তাঁর রূপ স্বতন্ত্র। ষট্‌স্থলের পরিণত স্থলের কবিতায় ভক্ত-দেবতার ব্যক্তিগত সম্পর্কের থেকেও বেশি প্রকাশ পায় শাশ্বত সত্যের অন্বেষণ, চলজ্জীবনের মায়াবন্ধন ছিন্ন করার প্রচেষ্টা। বচন-কবিরা সুসাহিত্য তৈরি করতে চাননি, চেয়েছিলেন নিজের ভাষায়, নিজের অন্তরের গহনতম অনুভবকে ব্যক্ত করতে। ভাষা ও গঠনশৈলীর পূর্ণ স্বাধীনতায় মাতৃভাষায় রচিত বচন-কবিতায় কবির নিজস্ব দর্শনের প্রকাশ। বচন ধরাবাঁধা গতে-ফেলা কবিতা নয়, তাতে সহজ সারল্যের সঙ্গে আছে অতুলনীয় স্বকীয়তার মিলন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আবেগ, কিছু চিন্তার সঙ্গে কিছু ব্যাকুলতা। স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে কবি ডাক দেন কখনও প্রাণেশ্বরকে, কখনও পাঠককে। কখনও-বা সতীর্থ কবিকে।

বচনসাহিত্যে সমকালীন অন্যান্য বচনকারদের উদ্দেশে প্রায়ই নানাধরনের

বিস্ময়বাচক মন্তব্য, প্রশ্ন, উত্তর ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজস্ব ইষ্টদেবতার নামটি নিজের বচনে স্বাক্ষরের মতো করে ব্যবহার করেছেন, বাসবান্নার যেমন 'কুড়লসঙ্গমদেব', আক্কা মহাদেবীর 'চেন্নামল্লিকার্জুন', আল্লামার 'গোহেশ্বর'। আক্কা মহাদেবী যেমন শব্দ নিয়ে খেলতে ভালোবাসেন, তেমনি আরো অনেকেই শব্দের ঝঙ্কার সৃষ্টিতে সুপটু ছিলেন। গদ্যে রচিত হলেও বচনগুলি বিশুদ্ধ কবিতা, কেননা বচনের 'বক্তব্য' সবই রূপক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত। কিছু কবিতায় হয়তো বহু প্রচলিত প্রাচীন প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন নদী, সমুদ্র, বীজ, জীবজন্তু, আত্মাকে নারী ও ঈশ্বরকে পুরুষ হিশেবে দেখা) কিন্তু কোনো কোনো বচনকারের প্রতীক স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এবং সম্পূর্ণ নতুন। আরো কিছু বচনে এমনই কঠিন জটিল রূপক ব্যবহার করা হয়েছে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বীরশৈব দর্শনের সঙ্গে অতিঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়। এইধরনের বচন বাংলাতে অনূদিত হয়নি।

গদ্যে হলেও বচনগুলিতে সুস্পষ্ট ছন্দঝংকার স্পন্দিত। অনেক সময়ে কবি পুনরাবৃত্তির সাহায্যে একধরনের মেজাজ সৃষ্টি করেন এই পুনরাবৃত্তি কিন্তু বাগ্মিতার নয়, অনেকটা মন্ত্রোচ্চারণের ঢঙে। যেমন আল্লামা প্রভুর :

শিলায় যেমন অগ্নি
জলে যেমন বিম্ব
বীজে যেমন বৃক্ষ
শব্দে যেমন নৈঃশব্দ্য
তেমনি ভক্তচিত্তে তুমি, হে গোহেশ্বর।

কখনো-বা তাঁরা পুনরাবৃত্তির বদলে বৈপরীত্যের সাহায্য নিয়েছেন। যেমন :

জল নিয়ে এসেও যে
ভুলে গেলো স্নান
ফুল তুলে এনেও যে
ভুলে গেলো পূজা—

বচনকারদের সঙ্গে তাঁদের ইষ্টদেবতার সম্পর্ক এত প্রত্যক্ষ, ঘনিষ্ঠ এবং এতই স্বচ্ছন্দ,

স্বাভাবিক, যে দেবতার সঙ্গে তাঁদের মানবিক মান-অভিমান দেখলে বিস্ময় বোধ হয়। প্রতিটি প্রধান বচনকারই যদিও সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরনে লিখে গেছেন, কিন্তু ইষ্টদেবতার সঙ্গে এই সহজ ঘনিষ্ঠতা প্রধান এবং অপ্রধান প্রত্যেকের মধ্যেই প্রস্ফুট। কেউ বলছেন (আল্লামা প্রভু) :

বাঁধই যদি জল খেয়ে নেয়,
বেড়াটা খায় শস্যক্ষেত্র যদি,
গিন্নি যদি ভাঁড়ার করেন চুরি,
আর তুমিই যদি আমার ওপর রাগো,
—হায় রে গোহেশ্বর !

অন্যত্র আল্লামা বলেছেন :

আমিই কি দেব নই ?
তুমি আর দেবতা কিসের ?
তুমিই দেবতা যদি
আমাকে পাল্‌ছো কই শুনি ?

বাসবান্না বলছেন :

পরের চিন্তা কেন করি ?
নিজেরই কি ঢের চিন্তা নেই ?
কুডলসঙ্গমদেব আমার দিকে চেয়ে হাসলেন কিনা
সেই চিন্তাটাই তো মস্ত, বিশাল
মেঝেয় পেতে, সর্বাঙ্গে জড়িয়ে
গড়াগড়ি দেবার মতো বড়ো সড়ো।

কেউ বলছেন, "টাকার জন্য মানুষকে কষ্ট করতে দেখেছি, কষ্ট করতে দেখেছি অন্নের জন্য, যশের জন্য, কই, তোমার জন্য তো কাউকেই কষ্ট করতে দেখলাম না, হে শিব !" কেউ-বা তাঁকে দেখছেন তরুণ প্রেমিক হিশেবে, শৃঙ্গার রসের মধ্য দিয়ে। যেমন আক্কা মহাদেবী।

তোমাকেই পেয়ে নরকেও যাই যদি
সেই তো আমার মোক্ষ
তোমাকে না পেয়ে মুক্তিও পাই যদি
সেই তো আমার নরক—।

বচনকারদের মধ্যে প্রাচীনতম বলা হয় জেডর দাসীমাইয়াকে—তিনি সম্ভবত একাদশ শতকের শেষ দিকে দ্বাদশের প্রথমদিকে লিখে গেছেন। তাঁর লেখা যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমনি সোজাসুজি। হয়তো-বা একটু সূক্ষ্মতার অভাব আছে, হয়তো একটু রুক্ষই তাঁর ভাষা, কিন্তু সারল্যে এবং বলিষ্ঠতায় তিনি তুলনাহীন। তেমনি সম্মুখস্বামী সম্ভবত শেষতম বচনকার। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে লিখেছেন, তাঁর রচনা ঢের বেশি দার্শনিক, তাত্ত্বিক, পরিশীলিত। প্রধান বচনকারেরা লিখেছিলেন মূলত দ্বাদশ শতাব্দীতে—আল্লামা প্রভু, বাসবান্না এবং আক্কা মহাদেবীই তাঁদের মধ্যে প্রধান।

পাঠকদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বচন অনুবাদ করতে করতে আমি সীমাহীন বিস্ময় এবং গর্ব অনুভব করেছি। দ্বাদশ শতকের মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে, সুদূর কর্নাটকে যে এতোদূর আধুনিক কবিতা রচিত হয়েছে, বাংলায় বসে আমার সে সম্বন্ধে ধারণা ছিলো না। আরও অবাক করেছেন বচনস্রষ্টা মহিলারা। অসামান্য তাঁদের সৎসাহস, অনমনীয় তাঁদের আত্মবিশ্বাস এবং উজ্জ্বল তাঁদের কাব্যকৃতিত্ব। অধ্যাত্মবোধের গভীরতায় ও ভক্তিতত্ত্বের পারদর্শিতাতেও তাঁরা নমস্য। দ্বাদশ শতকের হিন্দু সমাজের বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে যেভাবে আপন আদর্শ ও বিশ্বাসের বলে একক নিষ্ঠায় পথ চলেছেন আক্কা মহাদেবী, সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহাগুরু আল্লামা প্রভুর সঙ্গে যেমন দুঃসাহসী বিতর্কে নেমেছেন মুক্তায়াক্কা, কর্নাটকের সেই প্রাচীনা তরুণীদের প্রতি সম্ভ্রমে আমাদের মাথা আজও নত হয়ে আসে।

প্রকৃতপক্ষে শরণরা বিপ্লবী সমাজসংস্কারক ছিলেন না। এটা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের উপরি-ফল মাত্র। দৈহিক শ্রমকে মূল্য দেওয়ায় যেমন ধনী-নির্ধন ভেদটি, তেমনি পণ্ডিত-মূর্খের ভেদটিও ঘুচে গিয়েছিলো। প্রত্যেকেই ভক্তি ও শ্রমের

বলে শরণ-সমাজে সম্মানিত আসন অধিকার করে পূর্ণ মর্যাদায় ধর্মাচরণ এবং 'বচন' সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাচীন সাহিত্যের মতোই বচন-সাহিত্যেও ধ্রুপদী দর্শন ও লোকদর্শন উভয়েরই সমন্বয় ঘটেছে। মিশে গেছে লোকভাষার সঙ্গে শিষ্টভাষা। ভারতবর্ষে লোকায়তের সংস্কৃতায়ন এবং সংস্কৃতের লোকায়িত হওয়াটা এতই স্বাভাবিক, যে এখানে লোকজ্ঞানের বাচনিক পরম্পরাকেও মার্কিনি পণ্ডিতদের ভাষায় "ক্ষুদ্রধারা" বলা ঠিক নয়। ভারতের মাটিতে লোকায়তের "ক্ষুদ্রধারা" প্রতি পদেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের "বৃহৎধারা"র সঙ্গে মিলেমিশে এক খাতে বইছে। এবং তার উল্টোটিও ঘটেছে প্রায়ই।

ভারতবর্ষে শৈবধর্মের প্রধান ধারা তিনটি। উত্তরে পাই কাশ্মীরের শৈবধর্ম "প্রতিভিজ্ঞা", দক্ষিণে কর্নাটকের "বীরশৈব" এবং পশ্চিমে গুজরাতের "পাশুপাত" সম্প্রদায়। চতুর্থ শৈব গোষ্ঠীটি পূর্বভারতে উড়িষ্যায় দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লিঙ্গ ও ঈশ্বর উড়িষ্যায় হয়েছেন লিঙ্গরাজ ও ভুবনেশ্বর। তুলনায় বাংলাতে শৈবধর্মের প্রতিপত্তি কম, যদিও লোকধর্মাচারে শিবের যথেষ্টই প্রাধান্য আছে, শিবমন্দিরগুলি প্রতিটি গ্রামের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ। কিন্তু ভক্তিসাহিত্য বলতে বাংলায় বৈষ্ণব ও শক্তি ধারাই প্রধান। শৈব ধারাটি শাক্ত ধারাতেই মিশে গেছে। শিবের গীত কি গাজনের গান বাংলায় লৌকিক সাহিত্য পর্যায়েই থেকে গেছে। 'শিবায়ন' কাব্যসমূহ মনসা, অন্নদা, চণ্ডী ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যগুলির তুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি, যদিও সবগুলিতেই শিবের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, এবং বাংলা সাহিত্যে শিব একটি আর্কিটাইপ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও শিব তাঁর রুদ্র এবং ললিত রূপে বারংবার নন্দিত হয়েছেন। শিব নিজে বাঙালির আপনজন বটে, কিন্তু শৈবধর্মতত্ত্ব শাক্তধর্মের সঙ্গে মিশে যাওয়াতে, শৈবধর্ম বলতে এখন প্রধানত লোকধর্মই বোঝায়।

এখানে ব্যবহৃত বীরশৈব ভক্তিতত্ত্বমূলক ও কবিজীবনী সম্পর্কিত তথ্যগুলি প্রধানত শ্রীপ্রভুশংকরের একটি অপ্রকাশিত দীর্ঘ ইংরিজি প্রবন্ধ (কন্নড় ভাষাতে দেওয়া হুবলির বীরশৈব বক্তৃতামালার অনুবাদ) থেকে গৃহীত। বাকিটুকু নেওয়া হয়েছে ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত এইচ পি মল্লদেবারুর লেখা 'এসেন-শিয়াল্‌স্ অব্ বীরশৈবিজ্‌ম্' বই থেকে। ভক্তিতত্ত্বমূলক তথ্যাংশটি সংকলনে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অন্তরা দেব সেন। কবিজীবনী তথ্যাংশটি সংকলনে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী নন্দনা দেব সেন।

বীরশৈব সাধনা প্রসঙ্গে*

১ **লিঙ্গধারণ :** অন্যান্য শৈব গোষ্ঠীর থেকে বীরশৈব গোষ্ঠীর পার্থক্য প্রধানত লিঙ্গধারণে। বীরশৈব ভক্তকে স্ব-দেহে তার ইষ্টলিঙ্গটিকে সদাসর্বদা পরিধান করে থাকতে হয়—দেহের সঙ্গে যেমন আত্মা অভিন্ন, ভক্তের অঙ্গে তেমনি ইষ্টলিঙ্গ। সেদিনের বীরশৈবরা আজকের দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গায়েৎ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন। লিঙ্গায়েৎদের মধ্যে আজও এই আচারটি অবশ্য পালিত হয়। জন্মমাত্রই একজন 'জঙ্গম' পূজারী এসে সদ্যোজাত শিশুর অঙ্গে লিঙ্গ পরিধান করিয়ে দেন যাতে সে সঙ্গে সঙ্গেই লিঙ্গায়েৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সন্ত অজগন্নার স্বদেহে লিঙ্গধারণ করার কাহিনীটিই এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে স্মরণীয়। সর্বাঙ্গ দিয়ে ইষ্টলিঙ্গের সুরক্ষার জন্য তিনি উপাস্যটিকে গলাধঃকরণ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

২ **অষ্টাবরণ :** যুদ্ধে সৈনিকের যেমন বর্ম, সংসারযুদ্ধে ভক্তের তেমনিই আটটি বর্ম আছে : অষ্ট আবরণ। বীরশৈব শরণের অষ্টবিধি সাধনার নাম অষ্টাবরণ—যা ভক্তের রক্ষাকবচস্বরূপ এবং অধ্যাত্মসাধনার বল। এই আটটি : গুরু, লিঙ্গ, জঙ্গম, পাদোদক, প্রসাদ, বিভূতি, রুদ্রাক্ষ এবং মন্ত্র।

'গুরু'—সর্বপ্রথম। গুরুই জানেন শিবের স্বরূপ। জানেন লিঙ্গ এবং অঙ্গের ঐক্য। দীক্ষা, শিক্ষা ও মোক্ষ—গুরু এই তিন পথের নির্দেশক। তাই লিঙ্গেরও আগে আসেন গুরু। তিনি হাত ধরলে তবে লিঙ্গের সঙ্গে পরিচয়। "দরজা দিয়ে হেঁটে এলেন চিরন্তন / দরজা দিয়ে হেঁটে এলেন মুক্তি স্বয়ং / জয় জয় গুরু নমো নমো গুরু / পরম গুরু হে নমো হে নমো।" (আক্কা মহাদেবী)

'লিঙ্গ'—শিব ও শক্তির অদ্বৈত রূপ। নিরাকার শিব ভক্তের জন্য লিঙ্গ-আকার নিয়েছেন। ঈশ্বর, পরমাত্মা, উপাস্য হলেন লিঙ্গ। ভক্ত, জীবাত্মা, উপাসককে বলা হয় অঙ্গ। সাধক কবি চেন্নাবাসবান্নার মতে লি-র অর্থ শূন্য, বিন্দুর (অনুস্বর) অর্থ দৈবলীলা এবং গম্=চৈতন্য, গতি, শক্তি। তিনের মিলনেই মুক্তি। লিঙ্গ তিন

* অষ্টাবরণ ও ষট্‌স্থলের স্পষ্টতর ব্যাখ্যার জন্য এ. কে. রামানুজনের করা চার্ট দুটি ব্যবহৃত হলো।

প্রকার : ভক্ত 'ইষ্টলিঙ্গ'কে পুজো করবেন, 'প্রাণলিঙ্গ'কে ধ্যান করবেন, 'ভাবলিঙ্গে' সমাধিস্থ হবেন। অঙ্গ লিঙ্গের সঙ্গে মিশে যাবে, শরণের এই সাধনা।

'জঙ্গম'—যে শরণ পরিব্রাজক, ঘুরে ঘুরে বীরশৈব ধর্ম প্রচার করেন, মানুষকে দীক্ষা দিয়ে অধ্যাত্মচেতনার বীজ বপন করেন, তিনিই 'জঙ্গম'। শিবই স্বয়ং জঙ্গমের বেশে ঘুরে বেড়ান মানুষকে মুক্তির সংবাদ দিতে, এমন কিংবদন্তি।

'পাদোদক'—গুরু-পাদোদক, লিঙ্গ-পাদোদক, জঙ্গম-পাদোদক—গুরু, লিঙ্গ ও জঙ্গম এই ত্রিমূর্তির চরণধৌতির জল ভক্তকে মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়। কেউ বলেন পাদ=গুরু, উদক=শিষ্য—দুয়ের ঐক্য 'পাদোদক'। কেউ বলেন পাদ= মোক্ষ, উদক=জ্ঞান। পা=পরমজ্ঞান, দো=দোষক্ষয়, দ=জন্মচক্র থেকে মুক্তি, ক=কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি। এমন নানান্ ব্যাখ্যা আছে।

'প্রসাদ'=প্রসন্নতা। ঈশ্বরের করুণা। লিঙ্গকে, গুরুকে ও জঙ্গমকে যে ভোজ্য দেওয়া হয় তাঁদের পুণ্যস্পর্শে তা পরিণত হয় প্রসাদে। এদের সুধা, সিদ্ধি ও প্রসিদ্ধি বলা হয়। প্রসাদ ভক্তকে পুণ্যবান্ করে। এছাড়া প্রসাদের একটি বড় সামাজিক দিক আছে। সকল ভক্ত একত্রে প্রসাদ ভক্ষণ করেন, সেখানে জাতি-কুল, শ্রেণী-বর্ণের ভেদ থাকে না। বীরশৈবদের মধ্যে এই ভেদহীনতা অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

'বিভূতি'—ধন, ঐশ্বর্য। ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন ভস্ম, যা মানুষী ত্রিগুণকে পুড়িয়ে দেয়। ক্ষার, অর্থাৎ অশুভের বিনাশ ও রক্ষা অর্থাৎ অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ—দুই-ই করে।

'রুদ্রাক্ষ'—রুদ্র যখন একাগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ত্রিপুর ভস্ম করে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন তখন তাঁর নিষ্পলক চোখ থেকে নির্গত একবিন্দু অশ্রুই রুদ্রাক্ষ। ভক্তকেও তেমনি একাগ্র হয়ে সমগ্র অশুভ শক্তিকে ভস্ম করতে হবে। রুদ্রাক্ষ সেই আত্মশক্তির প্রতীক।

'মন্ত্র'—সাধকের শেষ আভরণ। শিবপূজার মন্ত্রগুচ্ছ। "নমঃ শিবায়" এই 'পঞ্চাক্ষর মন্ত্র' বীরশৈব ভক্তের যথাসর্বস্ব। এই মন্ত্রের সাহায্যেই সাধক শিবের সাধনা করেন।

কবিতা ভালো লাগার জন্য আমাদের এসব জানার হয়তো প্রয়োজন নেই, কিন্তু বচনগুলিতে প্রায়ই 'শরণ' 'জঙ্গম' 'মন্ত্র' 'কায়ক' 'লিঙ্গ' 'বিভূতি' 'গুরু' 'ঐক্য' ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ থাকে। তাই অষ্টাভরণ ও ষট্স্থল বিষয়ে কিছু জেনে রাখা ভালো।

৩ **ষট্স্থল :** সৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই স্থলসমূহে বিধাতার লীলার প্রকাশ (বিশুদ্ধ বুদ্ধি / চৈতন্য থেকে জাগতিক কার্যক্রম)। ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চৈতন্য উন্মেষের বিভিন্ন ধাপমাত্র, মোক্ষলাভ পর্যন্ত। আধ্যাত্মিক চৈতন্যের এইরকম ছ'টি ধাপ স্বীকার করা হয়—তারই ভিত্তিতে ভাগ হয় বচন-কবিতা। এই ষট্স্থল হলো : (১) ভক্ত—ভক্তি ও কর্মের পর্ব, (২) মহেশ্বর—যন্ত্রণা ও প্রলোভনের পর্ব, (৩) প্রসাদী—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকি ভক্তের প্রতি ইন্দ্রিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধির পর্ব, (৪) প্রাণলিঙ্গী—অন্তঃকরণ শুদ্ধ করার পর্ব, (৫) শরণ—প্রায় উন্মাদনার পর্ব, যখন ভক্ত নিজের জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার স্পর্শ অনুভব করে, যখন সে অনুধাবন করে যে এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে সে আর আবদ্ধ নয়, (৬) ঐক্য—পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার চির আশ্রয় গ্রহণ। অঙ্গ ও লিঙ্গের মিলন, যার ওপরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ভরশীল।

লিঙ্গ
শিব
লিঙ্গ
অঙ্গ
ইষ্টলিঙ্গ
প্রাণলিঙ্গ
ভাবলিঙ্গ
আচারলিঙ্গ
গুরুলিঙ্গ
দেবলিঙ্গ
নরলিঙ্গ
প্রসাদলিঙ্গ
মহালিঙ্গ
ক্রিয়াশক্তি
জ্ঞানশক্তি
ইচ্ছাশক্তি
আদিশক্তি
পরাশক্তি
চিৎশক্তি

অঙ্গ

শিব
লিঙ্গ
অঙ্গ
ত্যাগাঙ্গ
ভোগাঙ্গ
যোগাঙ্গ
ভক্ত
মহেশ্বর
প্রসাদী
প্রাণলিঙ্গী
শরণ
ঐক্য
সদ্ভক্তি
নৈষ্ঠিকভক্তি
অবধানভক্তি
অনুভাবভক্তি
আনন্দভক্তি
সমরসভক্তি
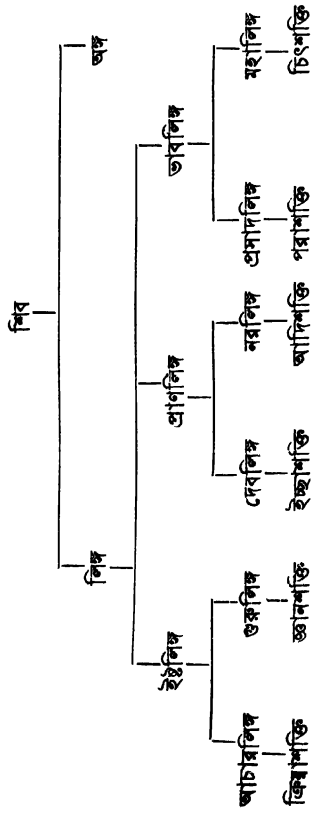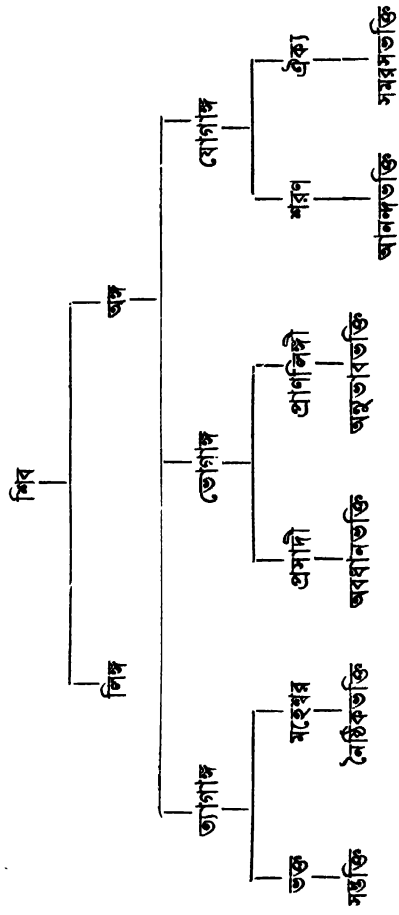
৪ কায়ক : দৈহিক শ্রমকে শরণরা স্বর্গসমান বলেছেন—"কায়কই কৈলাস" (বাসবান্না)। বিনা শ্রমের অন্নকে অনর্জিত অন্ন এবং পুণ্যবিরোধী মনে করতেন তাঁরা। সবরকম দৈহিক শ্রমকেই বীরশৈব ধর্মে পুণ্যকর্ম মনে করা হতো। বচনকারদের মধ্যে প্রাচীনতম, জেডর দাসীমাইয়া ছিলেন তাঁতি। তিনি বলেছেন :

তোমার শরণদের জন্য আমি
বলদ হতেও রাজী
তোমার শরণদের জন্য আমি
মজুর হতেও রাজী
ক্রীতদাস, কি প্রহরী কুকুরও হই
দরোজাতে—

কোনো কর্মকেই নীচ মনে করা হতো না। তাই ধোপা মাচাইয়া, জ্বালানিকাঠের যোগাড়ে মাড়াইয়া, নাপিত অপ্পান্না, মাঝি চৌড়াইয়া, মুচি হারলাইয়া, চামড়ার ব্যাপারী কাক্কাইয়া, বারাঙ্গনা বোম্মাইয়া, এমনকি একদা-চোর পর্যন্ত পরে সন্তকবি হয়ে একসঙ্গে মিলেমিশে অধ্যাত্মসাধনা করে শরণসমাজের জ্যোতির্বৃদ্ধি করেছেন। অধ্যাত্ম সাম্যবাদের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের তৈরি সামাজিক শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণী, জাতি, বর্ণবিভেদও আপনিই মুছে গেছে। বীরশৈব সাধনায় সবার উপরে কর্মী মানুষ সত্য, শ্রমের উচ্চনীচ ভেদ নেই।

বীরশৈব সন্তকবি প্রসঙ্গে

অনেকে বলেন বীরশৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাসবান্না। বাসবান্না বীরশৈব শরণদের নেতৃস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর আরেক নাম বাসবেশ্বর। প্রতিষ্ঠাতা না বলে তাঁকে বীরশৈব ধর্মের পুনরুদ্ধারকর্তা বলাই ভালো।

বাসবান্না

বিজাপুর প্রদেশের বাগাবাদী গ্রামের শৈব ব্রাহ্মণ বংশে বাসবান্নার জন্ম। বাগাবাদী একটি অগ্রহার, যেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাস। হিন্দুধর্মের সর্বশাস্ত্রেই তাঁরা বিশারদ ছিলেন, বেদ, উপনিষৎ, ভগবদ্‌গীতায়। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মাদিরাজ ও তাঁর স্ত্রী মাদাম্বে। বাসবান্না এঁদেরই সন্তান। তাঁর জন্মসালটি সঠিক জানা নেই বটে, কিন্তু ১১৩১ খৃষ্টাব্দ বলেই ধরে নেওয়া হয়। বাসবান্না বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং শাস্ত্রপাঠের আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু এই-ধরনের শুষ্ক ঈশ্বরসাধনায় তিনি উৎসাহ বোধ করেননি। অথচ আধ্যাত্মিক রুচি তাঁর চরিত্রে নিঃসংশয়েই প্রবল ছিলো, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার বিচারে, বৈদিক রীতিনীতিতে, বাহ্যিক নিয়মনিষ্ঠায় তাঁর শ্রদ্ধা ছিলো না বিন্দুমাত্র। বাসবান্নার ছিলো তীব্র ভক্তি। যখন উপনয়নের সময় এলো, তাঁর পিতা গভীর নিষ্ঠা সহকারেই তা সম্পন্ন করলেন। কিন্তু বালক বাসবান্নার এইসব আনুষ্ঠানিক আচার কিছুই মনের মতো লাগলো না। তাঁর মনে হলো "সন্ধ্যা-বন্দনা" ইত্যাদি বিধি পালনের কোনোই অর্থ নেই, প্রয়োজনও নেই। উপনয়নের অনুষ্ঠানের পরই তিনি উপবীত ছিন্ন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করলেন—তাঁর এই উপবীত ছিন্ন করাকে একজন কন্নড় কবি বলেছেন কর্মের সূত্র ছিন্ন করে মুক্তি খুঁজে নেওয়া।

অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে বালকটি কুডলসঙ্গমে গিয়ে পৌঁছোলো—কৃষ্ণা এবং মালপ্রভা নদীর মিলনতীর্থে। এই কুডলসঙ্গমের দেবতাই তাঁর প্রিয়তম ইষ্টদেব, তাঁর জীবনসঙ্গী হয়ে উঠলেন। এইখানেই তাঁর ধর্মগুরুলাভ হলো, ঈশান্যদেব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভক্তিও বৃদ্ধি পেলো, দশ বারো বছর ধরে তিনি ঐকান্তিক ঈশ্বরসাধনায় নিযুক্ত রইলেন। তীব্র, তীক্ষ্ণ, দেদীপ্যমান প্রতিভা ছিলো বাসবান্নার,

আর তাঁর চরিত্র সোনার মতো ঝলমলে। তাঁর সুনাম যে হাওয়ায় ভেসে ছড়িয়ে পড়বে, তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিলো না।

মঙ্গলচেড়ের রাজা ছিলেন চালুক্য বংশের বিজ্জল। বাসবান্নার মামা বলদেব ছিলেন তাঁর কোষাধ্যক্ষ। ভাগ্নের খ্যাতির সংবাদ পেয়ে বলদেব তাঁকে আনিয়ে কোষাগারে কাজ দিলেন, ও কন্যা গঙ্গাম্বিকার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। পরে কোনো কারণে মন্ত্রী সিদ্ধরসের কন্যা নীলাম্বিকাকেও বাসবান্না দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দু-এক বছর পরে, বলদেবের মৃত্যুর পরে বাসবান্নাই কোষাধ্যক্ষ হলেন।

এইসময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে যায়। বিজ্জল, যিনি এতদিন কল্যাণ-এর চালুক্য বংশের করদ রাজা ছিলেন, নিজেই সম্রাট হয়ে গেলেন, এবং কল্যাণ হলো তাঁর রাজধানী। বিজ্জলের সঙ্গে, ১১৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে বাসবান্নাও কল্যাণে বাস করতে গেলেন।

রাষ্ট্রনীতিতে বাসবান্নার কণামাত্রও উৎসাহ ছিলো বলে মনে হয় না, তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো মানুষী সংযোগের প্রতি, পূর্ণ ভক্তি ছিলো শিবের প্রতি এবং পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিলো শিবশরণদের প্রতি। জাতিভেদ বর্ণভেদ প্রথাকে আন্তরিক ঘৃণা করতেন বাসবান্না। অস্পৃশ্যতা ব্যাপারটাকেই তাঁর অনৈতিক অযৌক্তিকতা বলে মনে হতো। বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর ছিলো প্রবল অনীহা। পশুবলি দিয়ে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ হতো, তার বিরুদ্ধে বাসবান্না লিখেছিলেন : "ছাগল রে, প্রাণভরে কাঁদ্ / কাঁদ্ কাঁদ্ প্রাণভরে / বুকফাটা কান্নার শব্দে / ভরে ফ্যাল্ আকাশ বাতাস / শুনুক বিজ্ঞরা সব, / বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ সব প্রাজ্ঞরা শুনুক / অকারণ হত্যার কান্না / নিষ্ঠুর, নির্মম / পৌঁছোক, পৌঁছোক গিয়ে / কুডলসঙ্গমের সেই / দেবতার কানে / যা করার, তিনিই করবেন।"

বাসবান্না মুখে যা বলতেন, কাজেও তাই করতেন। তাঁকে দেখতে, এই মহাত্মা, সদাচারী, কাজে-কথায় অভিন্ন মানুষটিকে চোখে দেখতেই প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ আসতেন কল্যাণ শহরে। তাঁদের মধ্যেই এসেছিলেন মহাজ্ঞানী আল্লামা প্রভু, আক্কা মহাদেবী, সিদ্ধরাম, ইত্যাদি বীরশৈব ঋষি-কবিরা।

বাসবান্নার আদর্শ ছিলো "সবার নিচে সবার পিছে সবহারাদের" উন্নতি ঘটানো।

বীরশৈব ঋষি-কবিদের বিশিষ্ট অধ্যাত্মচেতনাও বিপ্লবী সমাজচেতনার আদানপ্রদান ঘটতো বাসবান্নার আশ্রমে। শিবের শরণাগতি, অসবর্ণ বিবাহ ও অসবর্ণ ভোজনের মধ্যে শরণরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। দীনদরিদ্র ও নীচ শ্রেণীর উন্নয়নে বাসবান্নার একান্ত আগ্রহ তাঁকে উচ্চবর্ণের বিষনজরে ফেলেছিলো। ঈর্ষ্যাপীড়িত হয়ে, এবং ক্রোধবশত অনেকেই তাঁকে বিজ্জলের বিরাগভাজন করার জন্য সচেষ্ট হলেন। প্রথমে তাঁরা কোষাগার লুণ্ঠনের অভিযোগ আনলেন বাসবান্নার নামে, যে তিনি প্রচুর ধনরত্ন চুরি করে প্রত্যহ শরণদের ভোজনের আয়োজন করছেন। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে বাসবান্নার একটি বিখ্যাত বচন রয়েছে :

ভয় পাই না সাপকে, আমি ডরাই না অগ্নিকে.
ভয় করি না মোটেই তরবারি—
একটি কেবল ভয়ের জিনিস, একটি ভয়ংকর—
অন্যজনের স্বর্ণ, এবং অন্যজনের নারী !
সময়মতো এসব জিনিস ভয় পেতে না শিখে
রাবণরাজা, কৌরবেরাও ভারি
শাস্তি পেলো, হায় নিয়তি, যন্ত্রণাজর্জর—
এসব দেখেও ভয় পাব না ? কুডলসঙ্গমের দেব্‌তা—
এ বড়ো ঝকমারি !

তারপরের অভিযোগটি বড় ভয়াবহ এবং অকাট্য—বাসবান্না অস্পৃশ্য পল্লীকে ভদ্রপল্লীতে তুলে আনছেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের উচ্চবর্ণের মর্যাদা বিনষ্ট করেছেন। তাঁরা রাজা বিজ্জলের কানের কাছে বলতে লাগলেন বাসবান্না অস্পৃশ্য গৃহ থেকে বেরিয়ে সোজাই রাজপ্রাসাদে চলে আসেন এক কাপড়ে, স্নান না করেই, পবিত্র না হয়েই। বিজ্জল এসবে কান দিলেন না। বাসবান্না জাতিবর্ণের ভেদ তুলে দিয়ে নবীন সমাজের প্রতিষ্ঠার কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সর্বান্তঃকরণে—এসব নিন্দেমন্দে তাঁর খেয়াল ছিলো না। এইসময়ে তিনি মধুবরষ নামে এক ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে হরলাইয়া নামে এক অস্পৃশ্যের পুত্রের বিয়ে দিলেন। এই ঘটনা সমাজে বিস্ফোরণ ঘটালো। সমাজের মূলে নাড়া পড়লো। ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে

অস্পৃশ্য যুবকের বিবাহ হলে সমাজ সংস্কার রাষ্ট্র সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণরা রাজার কাছে অভিযোগ করলেন। বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষাকর্তা রাজা পড়লেন সমস্যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি কন্যার পিতা ও পুত্রের পিতাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য হলেন। কল্যাণের শিবশরণদের গোষ্ঠী এতে অপমানিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এই সুযোগে বিজ্জলের রাজনৈতিক শত্রুরা তাঁকে হত্যা করলো, অনেকে বলেন ক্ষিপ্ত শরণরাও করে থাকতে পারেন। তার পরেই শরণরা কল্যাণ পরিত্যাগ করে চলে যান।

১১৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এসব ঘটেছিলো। এর ঠিক আগে বাসবান্না কল্যাণ ছেড়ে কুডলসঙ্গমে ফিরে যান এবং সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। 'কুডলসঙ্গমদেব' এই নাম ব্যবহার করেছেন বাসবান্না তাঁর বচনে। প্রায় দু'হাজার দুশোটি বচন, যা পাওয়া গেছে, বাসবান্নার কবিত্বময়তা ও ভক্তির আকুলতা সেখানে চমৎকার সব চিত্রকল্পের মধ্যে প্রকাশিত। "আমার চেয়েও নীচুতে কেউই নেই, শরণের চেয়ে উঁচুতেও নেই কেউ"—বাসবান্নার বিনয় এবং বিশ্বাসের এই শেষ পরিচয়।

মহাদেবী আক্কা

শিব-শরণদের মধ্যে নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মহাদেবী আক্কা এই সমদৃষ্টির প্রধান প্রমাণ স্বরূপ। কন্নড় ভাষার প্রথম কবিয়ত্রী মহাদেবী আক্কা, এবং কন্নড় দেশের প্রথম নারী mystic। মহাদেবীর মা বাবা কারা? তাঁর জন্ম কোথায়? বড় হয়েছেন কোন অঞ্চলে? তাঁর বিবাহ হয়েছিলো কিনা? ইতিহাসে এসব প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। মহাদেবীর নিজস্ব এবং তাঁর সমকালীন অন্যান্য কবির বচনগুলির থেকে যেটুকু খবর উদ্ধার করা গেছে কেবল ততটুকুই আমাদের সম্বল।

শিবমোগ্‌গা প্রদেশের উডুতাতি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিলো। কেউ বলে সুমতি এবং নির্মলার কোলে, আবার কেউ কেউ বলে, ওঙ্কারশেট্টি ও লিঙ্গাম্মার কোলে। দুটি দম্পতিই ঘোরতর শৈব, শিবপূজারী। বালিকা মহাদেবীও আবাল্য শিবভক্ত। আকুল শিবভক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সন্ন্যাস ভাবও বেড়ে উঠলো। ওদিকে ক্রমশ তিনি

যুবকদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো রূপবতী ষোড়শী হয়েছেন। ওই অঞ্চলের প্রধান শাসক, কৌশিক, পরমাসুন্দরী মহাদেবীকে এক ঝলক দেখেই তাঁকে বিবাহ করবার জন্য মত্ত হয়ে উঠলেন। যে কোনো মূল্যেই এই রূপসীকে তাঁর চাই। কিন্তু মহাদেবীও মনস্থির করেছেন, কোনো নশ্বর মানুষ নয়, শিবই স্বয়ং তাঁর স্বামী।

কিন্তু শাসকের তরবারির কাছে নতি স্বীকার করতেই হলো তাঁকে। নিজের প্রাণভয়ে নয়—পিতামাতাকে শাস্তি পেতে হবে, এই ভয়েই তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহে রাজী হলেন। প্রাসাদে বাস করা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। মানুষ স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া শিবজায়ার পক্ষে দুরন্ত যন্ত্রণার শামিল। শেষ পর্যন্ত তিনি পতিকে পরিত্যাগ করেন। কোনো রত্ন আভরণ, কোনো মহার্ঘ সাজসজ্জা, এমনকি রাজগৃহের বস্ত্রখণ্ড অঙ্গে না রেখে কেবলমাত্র ঈশ্বরের করুণায় আবৃত হয়ে শুদ্ধচিত্তে নগ্নদেহে রাজপ্রসাদ ত্যাগ করে তরুণী মহাদেবী তপস্যার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। দেবতা চেন্নামল্লিকার্জুনের প্রগাঢ় কৃপায় যাঁর সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন তাঁর আর তুচ্ছ সুতোর আচ্ছাদন লাগবে কেন?

কেড়ে নেবে নাও গয়না শাড়ি
নগ্নতা নেবে কী করে কাড়ি?
যার অঙ্গ আবৃত দৈব কৃপায়
চেন্নামল্লিকার্জুনের বিভায়
সে দিয়েছে লোকলজ্জা পাড়ি।
কী হবে গহনা? কী হবে শাড়ি?

সংসারত্যাগিনী মহাদেবীকে শুভার্থী-বন্ধুরা প্রশ্ন করেছিলেন, অন্ন পাবে কোথায়? শয়ন করবে কোন্ হট্টমন্দিরে? যুবতীশরীর পবিত্র রাখবে কেমন করে? কে তোমাকে প্রহরা দেবে, রক্ষা করবে? মহাদেবী বললেন:

ভিক্ষা-অন্নে মেটাবো ক্ষুধা
কুয়োতে, পুকুরে, মিলবে সুধা
ভাঙা মন্দিরে পাতবো শয্যা

চেন্নামল্লিকার্জুন! ঢাকো হে লজ্জা—
তুমিই সঙ্গী, তুমিই রক্ষী,
তুমি যার, তার লাজ কী? শোক কী?

নারী বলে, তরুণী নারী বলে, এবং রূপবতী তরুণী নারী বলে, এই পূজারিণীর জীবনে অশেষ দুঃখ জুটেছিলো, কিন্তু সবকিছু অগ্রাহ্য করে তিনি নির্ভীক অরণ্য-বাসিনী তাপসী হয়েছিলেন। কিন্তু একসময়ে অরণ্য ত্যাগ করে কল্যাণ শহরের শিব-শরণদের আশ্রমে চলে গেলেন। যেখানে বাসবান্না, আল্লামা, সিদ্ধরামাইয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঋষিকবিদের মিলনতীর্থ। কিন্তু শরণদের অন্তর্ভুক্ত হতে মহাদেবীর অনেক বাধা ছিলো। এই নগ্ন তরুণী সন্ন্যাসিনীকে সকলে ভয় পেয়েছিলেন। সুদীর্ঘ কেশে তাঁর শরীর আংশিক আবৃত মাত্র—এই নারী কি সত্যিই দেহ ও যৌনতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন? তিনি কি সত্যিই অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পেয়েছেন? মহাদেবী কি জিতেন্দ্রিয়? তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিন্নরী বোম্মাইয়া নামে এক পরম রূপবান শরণ-কে পাঠানো হলো, মহাদেবীকে প্রলুব্ধ করতে। কিন্তু প্রলুব্ধ করতে গিয়ে সেই যুবক শরণ নিজেই প্রলুব্ধ হয়ে পড়লেন এবং প্রবল প্রয়াসে নিজেকে সংবরণ করলেন: "যদি সে সত্যিই মহৎকে চিনে থাকে, আমি তার সম্মুখে বিনত হবো, সে হবে আমার গুরু, জননী। কিন্তু যদি তার লজ্জাসংকোচ দেখি, যৌবন সচেতনে যে-কোনো রূপসীর মতোই, তবে আমি তাকে পত্নীরূপে কামনা করবো।" দর্শন করার পরে, মহাদেবীর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের পরম জ্যোতিতে বোম্মাইয়ার চোখ ঝলসে গেলো। আক্কার দেহমনে দেহচেতনা, যৌন-চেতনার তিলমাত্রও অবশিষ্ট ছিলো না, যদিও তিনি ছিলেন পূর্ণ যুবতী। মল্লিকা-র্জুনকে সর্বস্ব সমর্পণ করে, তিনি দেবতার সঙ্গে একাত্ম, মুক্তপ্রাণ সন্ন্যাসিনী। বোম্মাইয়া তাঁর পায়ে প্রণত হলেন। আক্কা নিজের মুক্তির আলোকে বোম্মাইয়া-কেও মুক্ত করলেন। বোম্মাইয়ারই ভাষাতে:

ত্রিভুবনের বিনাশকর্তা মহালিঙ্গদেব
আমার জন্য পেতেছিলেন ফাঁদ
তা থেকে আমাকে উদ্ধার করলে তুমি

আমাকে বাঘে ধরেছিলো—
তোমারই করুণার স্পর্শে
আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছি…

যে মণ্ডপে শরণদের আলাপ-আলোচনা চলতো, তার নাম ছিলো "অনুভব মণ্ডপ"। আক্কা মহাদেবী এই মণ্ডপে প্রবেশলাভ করার পরেও তাঁর বাধাবিঘ্নের সমাপ্তি ঘটেনি। আল্লামা প্রভু তাঁকে পরীক্ষা করে নিতে চাইলেন।

"তুমি নিরাবরণ থাকো কেন?" আল্লামার এই প্রশ্নের উত্তর মহাদেবী দেবার আগেই বাসবান্না তাঁর হয়ে উত্তর দিলেন। মহাদেবীকে দর্শনমাত্রেই বাসবান্না তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি অনুধাবন করতে পেরে গভীর শ্রদ্ধাবোধ করেছিলেন, এবং মহাদেবীকে আপন গর্ভধারিণীর সমান সম্মান দিয়ে মনে মনে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আল্লামার প্রশ্নের জবাবে বললেন: "সেই অপরূপের সেবায় যারা নিযুক্ত, রূপের সেবায় তাদের কাজ কী? মনবুদ্ধির উর্ধ্বে যিনি। তাঁর সেবায় যে নিযুক্ত, অহংবোধে তার কাজ কী? সেই নগ্ন মহান দেবতাকে যে পুজো করে, কোপীনের বন্ধনে তার কাজ কী?"

কিন্তু আল্লামা ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বললেন: "হে ভগ্নি! তুমি বলছো দেবতা তোমার প্রেমিক, তুমি দেবতার! তার অর্থ কী? যদি তুমি সর্ব আবরণ ত্যাগই করে থাকো, তবে কেন কেশগুচ্ছ টেনে এনে লজ্জানিবারণ করছো? এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে তোমার দেহচেতনা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি। গোহেশ্বর লিঙ্গের তো এমন রুচি নয়।"

আক্কা জবাব দিলেন: "ফল যদি না পাকতো, শাঁস থেকে খসে পড়তো না তার খোসাটা। আমি কামদেবের চিহ্নটিকে যদি কেশরাশি দিয়ে মুছে ফেলেই থাকি, যাতে সেই পাঞ্জাছাপ দেখে তোমাদের প্রাণে দুঃখতাপ না জাগে, তাতে তোমারই বা এত বিতৃষ্ণা কেন? ভাই হে, প্রভু চেন্নামল্লিকার্জুনে নিবেদিত প্রাণ ভক্তকে বৃথাই জ্বালাতন করো না।"

কিন্তু আল্লামা এতেও নিবৃত্ত হলেন না—সম্ভবত "অনুভব মণ্ডপে" উপস্থিত অন্যান্য শরণদের কাছে মহাদেবীর আধ্যাত্মিক পরাকাষ্ঠার প্রকৃত পরিচয় দেবার

উদ্দেশ্যেই তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন : "রূপ ধারণ করেও তুমি বলছো, অরূপের সঙ্গে তোমার মিলন হয়েছে—হে ভগ্নি, কী করে তা সম্ভব ?" আক্কার উত্তর এলো :

তরল ঘি আর জমাট ঘিয়ে তফাৎটা কী
প্রদীপ এবং দীপ্তিতে আর তফাৎটা কী
অঙ্গেতে আর লিঙ্গেতে আর তফাৎটা কী
অঙ্গ আমার গুরু করেছেন মন্ত্রান্বিত
সাকার এবং নিরাকারেই তফাৎটা কী
চেন্নামল্লিকার্জুনের সঙ্গে মিলন হয়ে
পাগল যে-জন, কী হবে তার বাক্যব্যয়ে ?

চেন্না বাসবান্না মুগ্ধ হয়ে আক্কাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন :

হাজার বছর যারা বেঁচে আছেন
তাঁরা কি আত্মায় পক্ক ?
যে ধ্যানী ঋষিরা তপস্যা করেন
যতক্ষণ না বল্মীক গড়ে ওঠে তাঁদের ওপরে
এবং বেতবন গজায় বল্মীকের ওপর
তাঁরা কি আত্মায় পক্ক ?
কোমরভাঙা, ঢেঁকুর-তোলা,
নড়বড়ে-ঘাড়, পাকামাথা, ভীমরতি-ধরা
বুড়োগুলো, যারা একটা কথা বলতে গিয়ে
ন'রকম কথা বলে—সেই যে
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা
তাঁরাই কি আত্মায় পক্ক ?
অভ্রান্ত পথটি চিনে নিয়ে—
চিরায়তের মধ্যে তন্ময় হয়ে যাওয়া—
সেই তো আমাদের আক্কা মহাদেবীর বৈশিষ্ট্য !

এবারে আল্লামা প্রভুদেব মহাদেবীকে প্রণাম করে বললেন :

সেই নারী দিব্যপ্রভা হয়ে
দ্বৈতাদ্বৈত দ্বন্দ্ব মুছে দেয়
সেই নারী লিঙ্গ গোহেশ্বর,
অতি নম্র প্রণাম তোমায়।

আক্কা মহাদেবীর বৈরাগ্য, তাঁর গভীর অধ্যাত্মবোধ এবং শরণদের সঙ্গ তাঁকে তূরীয়ানন্দ দিয়েছিলো। সেই থেকে পার্থিব জীবনে তাঁর কোনোই আগ্রহ ছিলো না। তিনি শ্রীশৈলের কদলীবনে গিয়ে দেহরক্ষা করবেন বলে মনস্থির করলেন। আক্কা ছিলেন চেন্নামল্লিকার্জুনে সমর্পিত দেহমন।

জন্ম নিয়েছি শ্রীগুরুর হাত থেকে
বড় হয়েছি শরণদের আশ্রয়ে
দ্যাখো হে—
অনুভূতির ঘনদুধ আর সদ্জ্ঞানের ঘিয়ে
পরম শ্রেয়ের চিনি মিশিয়ে
এই তিনটি খাইয়ে তাঁরাই আমায়
মানুষ করেছেন।

মরধামের কাজ সম্পূর্ণ করে 'শ্রীশৈল' পর্বতে তিনি তীর্থযাত্রা করলেন এবং সেখানেই দেহ রাখলেন। প্রায় ৩৬৫ বচন আছে আক্কার—এ ছাড়া "সৃষ্টির বচন" ও "যোগাঙ্গত্রিবিধি" বলেও তাঁর বই ছিলো।

মুক্তায়াক্কা ও অজগন্না

অজগন্না ও মুক্তায়াক্কা ভাই-বোন দুজনেই বীরশৈব সাধনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। অজগন্না ছিলেন মৌনব্রতী ভক্তসাধক, তিনি তাঁর সমগ্র তপস্যার কালব্যাপী দীর্ঘ মৌন অবলম্বন করেন। কথিত আছে যে জীবনের প্রথমদিকে তিনি তাঁর ইষ্টলিঙ্গকে গলাধঃকরণ করেছিলেন, সমগ্র দেহমন দিয়ে ইষ্টদেবতার পালন ও সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষায়। ষট্‌-স্থলের বিধি অনুযায়ী ইষ্টদেবের সঙ্গে

একাত্মতাই (ঐক্য) সাধনার শেষ ধাপ। অজগন্নাকে বচন-রচয়িতারা অনেকেই আধ্যাত্মিক চেতনার সূক্ষ্মতম অভিজ্ঞতার উদাহরণস্বরূপ মনে করেন। দুঃখের বিষয়, অজগন্না রচিত একটিও বচন পাওয়া যায়নি।

মুক্তায়াক্কার বচনে প্রায়ই ভাই অজগন্নার উল্লেখ থাকে। ভাই-বোন সম্ভবত বিজাপুরের ইন্দি তালুকের মাসালিকাল্লু গ্রামের লোক ছিলেন। মুক্তায়াক্কা বিবাহিতা, তাঁর স্বামী গৃহেই থাকতেন, সম্ভবত ভাই অজগন্নাও তাঁরই আশ্রয়ে বাস করতেন। অজগন্না মৌনী, তাঁর জপও ছিলো নিঃশব্দ। একদিন তাঁর ব্রতভঙ্গ হলো। অজগন্না বাইরে থেকে ঘরে ফিরছিলেন, দরজায় অন্যমনস্কভাবে মাথাটা হঠাৎ ঠুকে যেতেই, তাঁর মুখ থেকে আপনা আপনি "নমঃ শিবায়" শব্দ নির্গত হলো। অনিচ্ছাকৃত এই ব্রতভঙ্গের বেদনায় অজগন্না অত্যন্ত আর্ত হয়ে পড়লেন, তাঁর মনে হলো জীবনে কিছুই লাভ হয়নি। এটুকু আত্মসম্বরণও যখন তাঁর আয়ত্তে আসেনি, তখন আর জীবন ধারণ করা কেন ? অজগন্না ক্ষোভে দেহত্যাগ করলেন।

সাধক ভাইয়ের এই অকালমৃত্যুতে মুক্তায়াক্কা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি দুঃখ করে লিখলেন, "ভাই অজগন্না, তুমি আমার সামনে অধ্যাত্মবোধের দর্পণ তুলে ধরলে, অথচ আমার চোখ দু'খানিই দিলে বেঁধে।" মুক্তায়াক্কার অধ্যাত্মচেতনা ছিলো প্রবল, ভাইয়ের সংস্পর্শে তিনি আত্মানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ঠিক এইসময়েই ভাইয়ের আত্ম বিসর্জন দেওয়া তাঁর বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ালো। এমন এক চরম আধ্যাত্মিক বিপন্নতার মুহূর্তে আল্লামা প্রভুর আবির্ভাব ঘটলো মুক্তায়াক্কার জীবনে। দু'জনের মধ্যে যে বিখ্যাত কথোপকথন হয়েছিলো, তার রস আজও আমরা আস্বাদন করতে পারি। আল্লামা রূপকের মাধ্যমে মুক্তায়াক্কাকে প্রশ্ন করেছিলেন, মুক্তায়াক্কাও রূপকেই তার উত্তর দেন। মুক্তায়াক্কা ছিলেন অসামান্য ধীমতী মহিলা। তিনি বিনা প্রশ্নে বিনা প্রমাণে কিছুই মেনে নিতেন না। যুক্তিবুদ্ধিকে তুষ্ট না করে তিনি ভক্তিকেও সহজ স্বীকৃতি দেননি। নারী বলে তাঁর মনে কোনো সামান্যতার বোধ ছিলো না, শরণদের গুরু আল্লামা প্রভুর সঙ্গে তিনি সমানে সমানে তর্ক করেছিলেন। প্রভু আল্লামার আধ্যাত্মিক মানকেও তিনি প্রশ্ন করতে দ্বিধা করেননি। তর্কে তুষ্ট হয়ে তবে তিনি আল্লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মুক্তায়াক্কার বচনে আক্কা মহাদেবীর মতো ভক্তিনম্রতার চেয়ে বরং যুক্তির প্রখরতার স্পর্শই বেশি। তাঁর ভাষাও তীক্ষ্ণ এবং স্বচ্ছ। আক্কা মহাদেবীর পরই মুক্তায়াক্কা নারী-বচনকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা পেয়েছেন।

আল্লামা প্রভু

আল্লামা প্রভু ছিলেন শরণদের গুরু। তিনি ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেরই গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। প্রভুদেবের বিশেষত্ব ছিলো তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য দিতেন 'জ্ঞান'কে। তাই 'কর্ম' ও 'ভক্তি'র সাধকদের প্রথমেই হতে হতো তাঁর মৃদু ব্যঙ্গের শিকার। পরে অবশ্য তিনিই তাঁদের জ্ঞানের শিখরে উন্নীত করতেন।

প্রভুদেবের জীবন বিষয়ে খুব বেশি জানা যায়নি। তাঁর জন্মস্থান কর্নাটকের শিবমোগ্‌গা জেলার শিকরিপুর তালুকের অন্তর্গত বল্লিগাভে গ্রাম। সম্ভবত তিনি 'নটুয়া' জাতি (নট)। তাঁর পিতা নিরহঙ্কার নামে পরিচিত ছিলেন এবং এক প্রাসাদের 'নাগভাস' (নৃত্যমহল ও সঙ্গীতমহল) ছিলো তাঁর দায়িত্বে। ছোটবেলা থেকেই আল্লামা 'মাদালে' (মাদল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র) বাজাতে ভালোবাসতেন ; কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন পারদর্শী।

সেই শহরেরই ধনদণ্ড নাগরিকের কন্যা কামলতা আল্লামাকে ভালোবাসেন ও তাঁদের বিবাহ হয়। কিন্তু দাম্পত্য সুখ হলো ক্ষণজীবী ; জ্বরে কামলতার অকাল-মৃত্যু হয়। মর্মাহত আল্লামা তাঁর জন্মস্থান ছেড়ে চলে যান। একদিন, শহর থেকে কিছু দূরে এক বাগানে বসে থাকাকালীন মাটিতে একটি স্বর্ণকলসের চূড়া তাঁর চোখে পড়ে। সেখানে মাটি খুঁড়ে এক শিবমন্দির খুঁজে পান আল্লামা। মন্দিরের ভেতরে তিনি দেখা পান অনিমিষাইয়া (নিষ্পলক) নামে এক বৃদ্ধা যোগীর। বৃদ্ধকে ঘিরে অলৌকিক এক তীব্র দীপ্তি। তিনি আল্লামার হাতে এক ইষ্ট-লিঙ্গ তুলে দিয়েই তাঁর পার্থিব বন্ধন ত্যাগ করলেন। সেই পুণ্য মুহূর্তে অনিমিষাইয়া হলেন আল্লামার গুরু, সেই লিঙ্গ হলো আল্লামার ইষ্ট দেবতা। আল্লামার ইন্দ্রিয়ানু-ভূতির জীবন পরিবর্তিত হলো ঘোর সন্ন্যাসে। এই অসাধারণ অভিজ্ঞতা তিনি

একটি বচনে বিবৃত করেছেন (৪২)। যে সাধারণ মানুষটি মন্দিরে প্রবেশ করে-ছিলেন, তিনি হয়ে উঠলেন প্রথমে শিষ্য, পরে 'গুরু' এবং মন্দির থেকে বাহির হলেন প্রভুদেব হয়ে। এবার শুরু হলো অনির্দিষ্ট স্বেচ্ছাযাত্রা এই মহাপুরুষের, যিনি একাধারে গুরু, লিঙ্গ ও জঙ্গম। অগুনতি মানুষের অগুনতি সমস্যার সমাধান করে তিনি অবশেষে পৌঁছলেন কল্যাণে। অধ্যাত্মবাদীদের (mystics) এই পীঠস্থানের প্রতিষ্ঠাতা বাসবান্নার চরিত্র ও স্বভাব তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করে। তিনি 'অনুভব মণ্ডব'-এর সকল তীর্থযাত্রী শরণদের অধ্যাত্মচেতনার পথে এগিয়ে আনেন। শেষ পর্যন্ত, যখন মহাবিপর্যয় ঘনিয়ে আসে কল্যাণের বুকে, শরণরা নানাদিকে ছড়িয়ে যান। আন্দাজ করা যায় যে সে সময়েই প্রভুদেব নিরুদ্দেশ হন।

আল্লামা প্রভু ১৩০০টি অসামান্য বচন রচনা করে গেছেন।

চেন্নাবাসবান্না

চেন্নাবাসবান্না ছিলেন বাসবান্নার অগ্রজা নাগাম্মার পুত্র। তিনি বাসবান্নার সঙ্গে কুডলসঙ্গম থেকে মঙ্গলবোধ হয়ে কল্যাণ যাত্রা করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে চেন্নাবাসবান্নার জীবৎকাল মাত্র চব্বিশ বছরের। অল্পবয়সেই সুবৃহৎ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় চেন্নাবাসবান্না তাঁর মাতুলের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। যদিও বাসবান্নাই তাঁকে প্রথম মন্ত্রদীক্ষা দান করায় তাঁর গুরুপ্রতিম ছিলেন, চেন্নাবাসবান্না নিজগুণে অর্জন করেন বাসবান্নার গভীর শ্রদ্ধা। 'কর্মযোগিন্ সিদ্ধরাম'-এর মন্ত্র-দীক্ষা চেন্নাবাসবান্নাই করেন।

বাসবান্না বিজ্জলের হত্যার আগে বা পরে কপ্পডিসঙ্গমে যাত্রা করেন। অনেকের বিশ্বাস যে এইসময়ে বাসবান্না নিজে উত্তর কর্নাটক জেলার উলিভি শহরে পাঠান চেন্নাবাসবান্নার নেতৃত্বে শরণদের এক বিশাল দল। চেন্নাবাসবান্না লোকান্তরিত হন উলিভি নগরেই। তাঁর সমাধিমন্দির আজও সেখানে বর্তমান।

চেন্নাবাসবান্না রচিত ১৫০০টি বচন পাওয়া গেছে। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির উচ্চতা তাঁর রচনায় পরিস্ফুট।

আয়দক্কি মারাইয়া

মারাইয়া বাস করতেন রায়চুর জেলার অমরেশ্বর গ্রামে, তাঁর স্ত্রী লক্কাম্মার সঙ্গে। তাঁরা দরিদ্রতম হলেও, ছিলেন একান্ত শিবভক্ত। জীবিকার খোঁজে কল্যাণ পৌঁছলেন তাঁরা, তবে কোনো কাজই পেলেন না। তখন, চালের ব্যবসায়ীদের দোকানের ধারে ধারে ধুলোয় পড়ে-থাকা চাল কুড়িয়ে, তাঁরা শুধু নিজেদেরই নয়, আরও অনেক শিব-উপাসকের ক্ষুধা মেটাতেন। বাসবান্না তাঁদের ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের সাহায্য করার জন্য, দোকানের ধারে অধিক পরিমাণে চাল ছড়াবার ব্যবস্থা করেন। মারাইয়া তাঁর স্ত্রীর কাছে বেশি চাল দেখে, খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে বাসবান্নার দয়াই এর মূলে। রুষ্ট মারাইয়া মনে করেন এ বাসবান্নার ধনাভিমানের প্রতিফলন, তাই তিনি প্রত্যুত্তরে বাসবান্নার বাড়ির সামনে চাল ছড়িয়ে আসেন। বাসবান্না তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মারাইয়া মোটামুটি ৩৫টি বচন রচনা করেন।

উরিলিঙ্গ পেদ্দি

উরিলিঙ্গ পেদ্দি (আনু. ১১৮০) ছিলেন উরিলিঙ্গদেবের (আরেক বিখ্যাত বচন-রচয়িতা) শিষ্য। ধর্মাচরণের আগে উরিলিঙ্গ পেদ্দির জীবিকা ছিলো চৌর্য-বৃত্তি। একবার যখন তিনি রোজগারের জন্য উরিলিঙ্গদেবের মঠে যান, গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পান উরিলিঙ্গদেব তাঁর এক শিষ্যকে দীক্ষা দিচ্ছেন। সেই মুহূর্তে পেদ্দির মধ্যে এলো এক বিরাট পরিবর্তন। পেদ্দি সর্বতোভাবে অধ্যাত্মবাদী হতে চান, কিন্তু সাহস পান না উরিলিঙ্গদেবের কাছে যাওয়ার। তিনি তখন জালানি কাঠ বয়ে নিয়ে গেলেন সেই আশ্রমে এবং তার দামের বদলে উরিলিঙ্গদেবের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলেন। উরিলিঙ্গদেব জানতেন পেদ্দির পূর্বজীবিকার কথা, তাই তিনি নিস্তব্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু পেদ্দির মিনতিতে পরে তিনি গুরু হতে রাজী হন। পেদ্দি ২৯৫টি বচন রচনা করেন। তাঁর লেখা বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতিতে ভরা।

অম্বিগার চৌড়াইয়া

অম্বিগার চৌড়াইয়া ছিলেন জীবিকায় মাঝি, যা তাঁর নামের অর্থেই প্রকাশিত। তিনি নিঃসন্দেহে বাসবান্নার সমসাময়িক। তাঁর লেখায় সূক্ষ্ম আভিজাত্য না থাকলেও, তিনি তাঁর জীবিকার্জিত 'কায়ক'টিকে এক অসামান্য রূপকে পরিবর্তিত করে কয়েকটি উৎকৃষ্ট বচন রচনা করেন।

হডপড় আপ্পান্না

হডপড় আপ্পান্না ছিলেন বাসবান্নার ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর। তাঁর বিষয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি। বাসবান্না নাকি খুব পান খেতে ভালবাসতেন। 'হডপ' মানে চুপড়ি বা থলি। আপ্পান্না নাকি বাসবান্নার পানের থলি বয়ে বেড়াতেন। তাঁর লেখা ২২২টি বচন পাওয়া গেছে।

হাভিন হাল কল্লাইয়া

বিজ্জল যখন মঙ্গলবেদের রাজা, হাভিন হাল কল্লাইয়া তখন সেখানে বসবাস করতেন। তাঁর পিতা ছিলেন স্বর্ণকার। শোনা যায় একবার, হাভিন হাল কল্লাইয়া রাজা বিজ্জলের গহনা গড়ার আদেশ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অমান্য করেন। তিনি ছিলেন মহান্ পণ্ডিত। হাভিন হাল কল্লাইয়া কোন্ সময়ে কল্যাণে আসেন তা সঠিক জানা যায়নি। তাঁর লেখা ৬০টি বচন আমরা পেয়েছি।

জেডার (বা দেবর) দাসীমাইয়া

অনেকের বিশ্বাস, জেডার দাসীমাইয়াই ছিলেন সর্বপ্রথম বচন রচয়িতা। সম্ভবত, ১১৩৫-৪০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর 'কায়ক' (যা তাঁর নামের অর্থেই পরিস্ফুট) ছিলো তাঁতবোনা। তাঁর জন্ম গুলবর্গা জেলার মুদানুর গ্রামে। পত্নী দুগ্‌গলের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিলো অধ্যাত্মচেতনায় সুখে ভরা।

তিনি অনেকগুলি বচন রচনা করে গেছেন। তাঁর বচনে এক আশ্চর্য বলিষ্ঠতা ও সরলতা বর্তমান।

মাড়িবল মাছাইয়া

মাড়িবল মাছাইয়ার জন্ম বিজাপুর জেলার হিপ্পরিগে গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন রজক। মাড়িবল পিতার জীবিকাই গ্রহণ করেন এবং চালিয়ে যান কল্যাণে পৌঁছেও। বলা হয় যে বিজ্জলের হত্যার পর তিনি নিজে একটি দল গঠন করে বিজ্জলের সেনাবাহিনীর একটি অংশের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সম্ভবত এ সময়েই তাঁর প্রাণ যায়। কারি-তে তাঁর সমাধি আজও আছে। মাড়িবলের ৩৪৫টি বচন পাওয়া গেছে, এখনো পর্যন্ত।

সম্মুখস্বামী

১২ শতক থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত বচন রচনার ধারা বজায় রেখেছিলেন যে সামান্য কয়েকজন সাধক, সম্মুখস্বামী তাঁদেরই একজন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তিনি গুলবর্গার কাছে জেভারগিতে শরণদের একটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'অখণ্ডেশ্বর'-এর উদ্দেশে লেখা তাঁর বচনগুলিই সম্ভবত বীরশৈব বচন-ঐতিহ্যের শেষতম রচনা।

—